شانِ مُصطفیٰ ﷺ

শানে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম)

("আবদুহু" শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা)

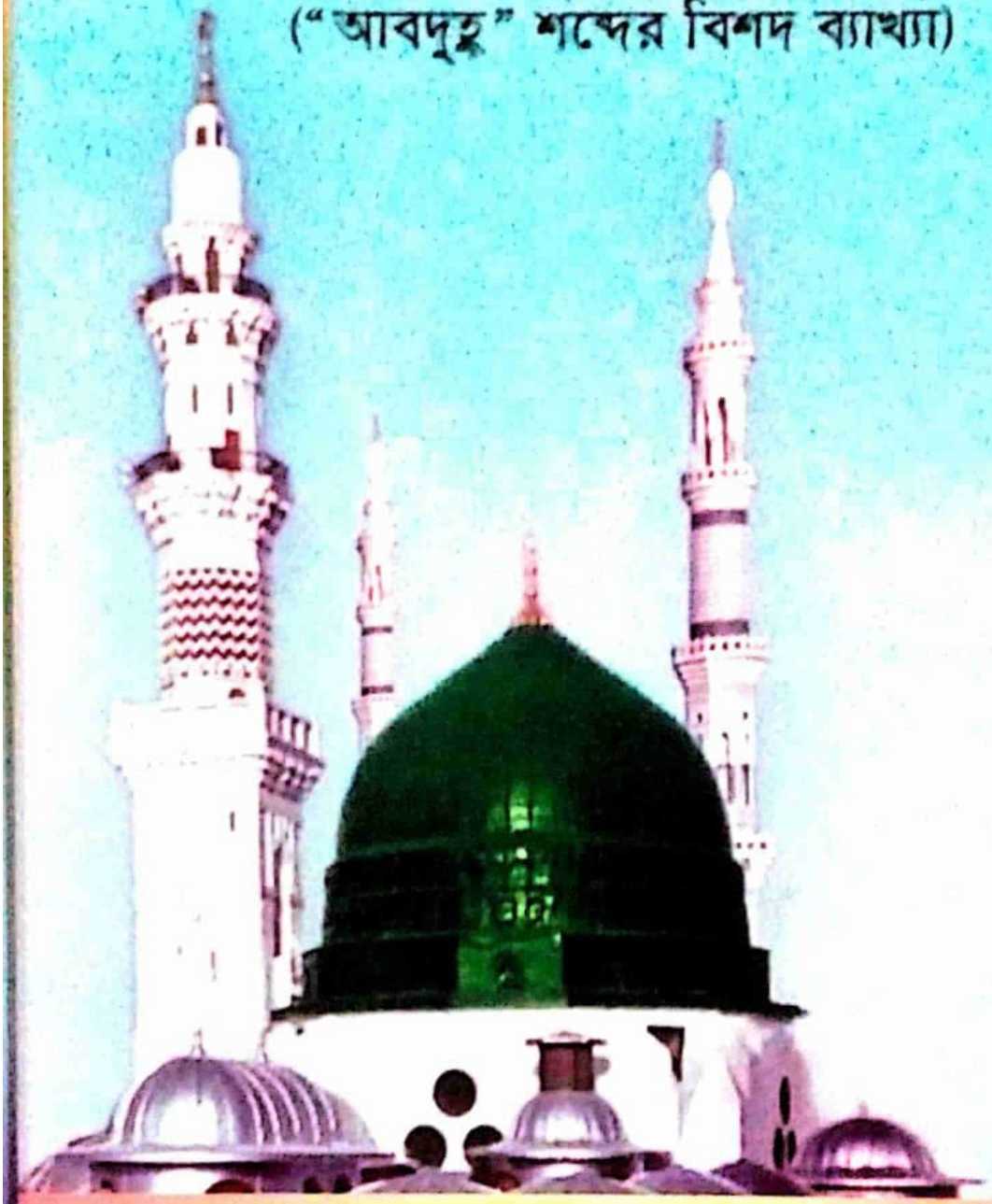

রচনায়

মুর্শেদে বরহক রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরিক্বত হযরতুল আল্লামা

মোহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী আল্-চিশ্তী আস্-সাঈদী (মা.জি.আ.)

প্রকাশনায়

আন্জুমানে কাদেরীয়া চিশতীয়া সাঈদীয়া বাংলাদেশ

ছিপাতলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

شانِ مصطفیٰ ﷺ

শানে মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম)

("আবদুহু" শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা)

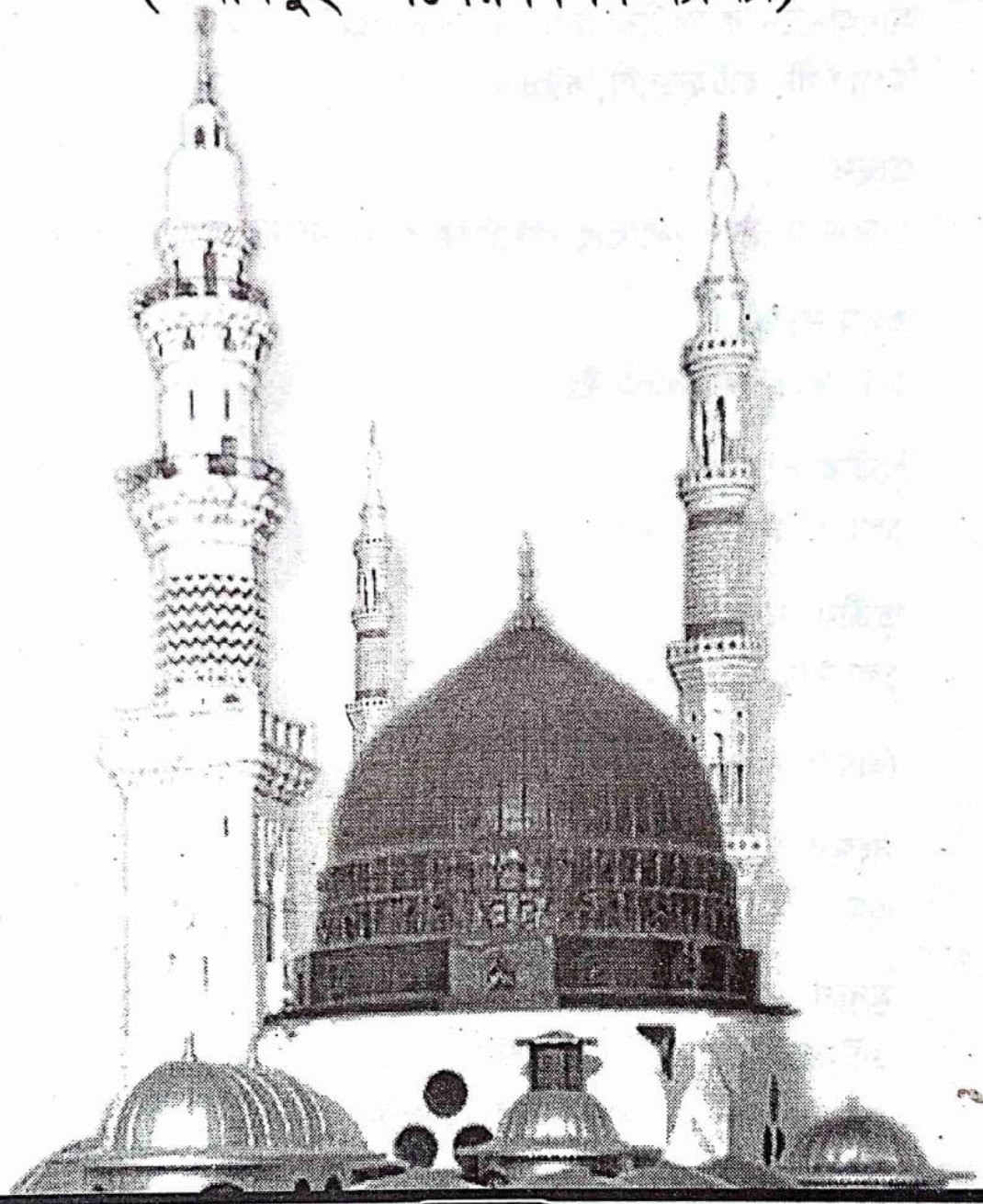

রচনায়

মুর্শেদে বরহক রাহ্‌নুমায়ে শরীয়ত ও তরিকৃত হযরতুল আল্লামা

মোহাম্মদ আজিজুল হক আল্‌-কাদেরী আল্‌-চিশ্‌তী আস্‌-সাঈদী (মা.জি.আ.)

প্রকাশনায়

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশতীয়া সাঈদীয়া বাংলাদেশ

ছিপাতলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

শানে মোস্তফা (ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম)
('আবদুহু' শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা)

প্রকাশনায়
আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশতীয়া সাঈদীয়া বাংলাদেশ
ছিপাতলী, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ
হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের রওজা শরীফ

প্রথম সংস্করণ
১লা অক্টোবর ১৯৮৩ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ
১লা এপ্রিল ২০০১ ইং

তৃতীয় সংস্করণ
১লা মার্চ ২০০৮ ইং

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

সংস্করণে
এম. এম মহিউদ্দীন

মুদ্রণে
এট্যাচ কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
মোহনা ম্যানশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

হাদিয়া
চল্লিশ (৪০) টাকা মাত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

অতঃপর অধমের আবেদন এই যে, বর্তমান যুগে ইসলাম ধর্মে নানারূপ কলহ্ বিবাদের বিকাশ ঘটিতে রহিয়াছে।

বিশেষতঃ নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা স্থাপনকারী এবং আউলিয়ায়ে কেরামের সহিত সম্পর্ক রক্ষাকারীদেরকে 'বেদয়াতী' ও 'মুশরিক' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইতেছে। অথচ তাহারা জানে না যে, হুজুরের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁহার ভালবাসা ব্যতীত মুসলমান ও মুমিন হইতে পারে না। কেননা, নবী প্রেমই ঈমানের মূল ও প্রাণ। কোন উর্দু কবি এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেনঃ

مسلمان وہ نہیں ہے قدر نہ کی جس نے کچھ تیری

اگر ہے قدر داں تیرا تو کافر بھی مسلمان ہے

মর্যদা তোমার বুঝিল না যে, সে নহে মুসলমান,

কদর তোমার করিলে কাফের, হইবে সে পূণ্যবান।

ফিত্না সৃষ্টিকারী এই দলসমূহের উদ্দেশ্য হইল, নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা এবং 'মুতাশাবাহ' আয়াত সমূহের অপব্যখ্যার মাধ্যমে সরল প্রাণ মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করা। নবীজীর 'আবদিয়াত' ও 'বশরিয়াত' নিয়া তাহারা এমন অশালীন উক্তি করে যাহা তাঁহার মান-মর্যাদায় শোভা পায় না।

তাই অধম নিজের স্বল্প জ্ঞান এবং সময়ের স্বল্পতা সত্বেও এই পুস্তিকাখানা পাঠকদের সামনে পেশ করিলাম যেন ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয় এবং প্রকৃত 'মাসায়ালাটি' স্পষ্ট হইয়া যায়। নতুবা এই মহৎ কর্মের উপযুক্তও নহি।

কবির ভাষায়ঃ

نہ عزت نہ شہرت نہ خزینہ مطلوب

ہمکو ہے نسبت سرکار مدینہ مطلوب

নহে সম্মান, খ্যাতি ও সম্পদ আমার উদ্দেশ্য বাণী,
সম্পর্কই শুধু তাহারি সাথে মদীনার সম্রাট যিনি।

অবশেষে পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রহিল, যদি কোন স্থানে অধমের অযোগ্যতা ও অদক্ষতা প্রকাশ পায় তাহা মার্জনার চক্ষে দেখিবেন। এই গ্রন্থখানা আমি আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ও মুর্শিদ শেখে তরিকত, গজ্জালিয়ে জমান, রাজীয়ে ওয়াক্ত, মুহাদ্দেছে আজম আল্লামা **আহমদ সাঈদ কাজেমী** (রহঃ)-এর নামে উৎসর্গ করিলাম। সম্মানিত পাঠকদের নিকট আমার পুস্তক খানা উপকৃত প্রমাণিত হইলে আমাকে দোয়ায় স্মরণ করিবেন। মহান আল্লাহ্ আমার এই গ্রন্থখানা নাজাতের উছিলা হিসাবে গ্রহন করুন। আমিন।

আমি আমার এই পুস্তক খানা সর্ব সাধারণের পাঠের সুবিধার্থে সরল বাংলায় অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তজ্জন্য আমি প্রকাশনা সংস্থাকে আন্তরিক দোয়া করিতেছি।

ইতি-

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী আস্-সাঈদী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রশ্নঃ ছাইয়্যেদুল মোরছালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে কোরআন মজীদে 'আবদুল্লাহ (عَبْدُ اللّٰهِ) ' 'আবদুহু' (عَبْدُهٗ) বা যথাক্রমে 'আল্লাহর আবদ' 'তাঁরই আবদ' বলে আখ্যায়িত করার 'হেকমত' বা রহস্য কি? আমরা (সাধারণ মুসলমানগণ) ও তো 'আবদুল্লাহ' বা 'আল্লাহর আবদ'। আমাদের আবদিয়াত এবং বিশ্বনবী হুজুর করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের আবদিয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা? আর 'আবদুহু' (عَبْدُهٗ) এর অর্থ কি?

জবাবঃ 'আবদ' (عَبْدٌ) এ আরবী শব্দটা বিশেষ্যপদ (اسم), এর বহুবচন হয় 'এবাদুন' (عِبَادٌ) 'আবীদুন' (عَبِيْدٌ) এর অর্থ হলো 'বান্দা' 'গোলাম' ইত্যাদি। আর 'আবেদুন' (عَابِدٌ) বা আল্লাহর এবাদত বা 'উপাসনাকারী' অর্থে ও এশব্দটা ব্যবহৃত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, "عُبَّادٌ" (উব্বাদুন) শব্দটি বহুবচন, একবচন "عَابِدٌ" (আবেদুন) অর্থ এবাদতকারী। আর "عِبَادٌ" (এবাদুন) বহুবচন, অর্থ– আল্লাহর বান্দাগণ, একবচন "عَبْدٌ" (আবদুন), "عَبِيْدٌ" (আবীদুন) অর্থ গোলামসমূহ বা অসংখ্য দাস। উল্লেখ্য যে, মনে রাখা উচিত এই عَبِيْدٌ (আবীদুন) বহুবচন নহে বরং এটা "اسم جمع" (বহুবিধ বিশেষ্য) যার মধ্যে বহুবচনের অর্থ বিদ্যমান।

'আবদ' (عَبْدٌ) বিশেষ্য পদটির উৎস (مصدر) হয়ত عِبَادَةٌ(এবাদাতুন); - بَابِ نَصَرَ-يَنْصُرُ থেকে ব্যবহৃত। যেমন عَبَدَ يَعْبُدُ - তখন এর অর্থ হয় 'এবাদত করা', উপাসনা করা। عُبُوْدِيَةٌ (য়ুবুদিয়াতুন) শব্দটাও عِبَادَةٌ (এবাদত) এর প্রায়ই সমার্থক। তবে পার্থক্য হল এতটুকু যে, عُبُوْدِيَةٌ (য়ুবুদিয়াত) মানে স্বাভাবিক অর্থে বিনয় বা আনুগত্য প্রকাশ করা।

সৃষ্টি জগতের "عَبْدِيَتْ"(আবদীয়াত) বা বান্দা হওয়া এবং জনাবে মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর"عَبْدِيَتْ" বা বান্দা হওয়ার মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। কেননা লোকগণ শুধুমাত্র 'মাবুদ' তথা আল্লাহ তা'লার গজব, কহর ও শাস্তির ভয়ে এবং সর্বোপরি ছাওয়াব এবং জান্নাত পাওয়ার লোভ-লালসায় এবাদত বন্দেগী করে থাকে। অথবা আল্লাহ তা'লার হুকুমের উপর আমল করতে গিয়ে একাগ্র চিত্তে আদায় করে থাকে, যাকে আমরা "عُبُوْدِيَتْ" (উবুদীয়ত) নামে নামকরণ করে থাকি।

কিন্তু হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর"عِبَادَتْ" (এবাদত) বা উপাসনা শুধুমাত্র এই জন্য যে, তিঁনি আল্লাহ তা'লার বান্দা। বান্দা আপন মাওলা বা মুনিবের "اطاعت" বা আনুগত্য করে থাকবে, যা আমাদের পরিভাষায় "عَبُوْدَتْ" (আবুদত) বলে থাকি।

যে এবাদত বন্দেগীর মধ্যে (معبود ও عبد) বান্দা ও মা'বুদের মধ্যবর্তী কোন পর্দা বা হিজাব তথা কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা হবে না, বরং "مشاهده خداوندى" তথা আল্লাহ তা'লাকে পাওয়ার জন্য (তাঁর দিদার লাভের জন্য) নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে "نُوْرٌ عَلٰى نُوْر" (নূরে নুরান্বিত) এর স্তরে পোঁছে যায়। যা অন্য কোন "مَخْلُوْقْ" (মাখলুক) বা সৃষ্টির জন্য সম্ভব হবে না। কাজেই এই মহান পবিত্র জাতে মোক্বাদ্দছাকে নিজের মত অকৃতকার্য বান্দার উপর কিয়াস করা অজ্ঞ, মূর্খতা ও বোকামী ছাড়া আর কি হতে পারে।

আর 'এবাদত' (عِبَادَةْ) এ مُبَالِغَةْ বা অতিশয়োক্তিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ অতিশয় ও সর্বাধিক বিনয় প্রকাশ করাই হলো عِبَادَةْ (এবাদত), যার একমাত্র দাবীদার হলেন সে অসীম দয়াময় ও পুরস্কারদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পাক জাত। সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়ে কুরআন মজীদে এরশাদ হচ্ছে,

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

অর্থাৎ, "তোমরা শুধু তাঁরই (আল্লাহর) এবাদত (উপাসনা) কর; (আর কারো নয়)"

তাছাড়া 'কামুছ' অভিধানে এ عِبَادَة (এবাদত) মানে আনুগত্য করা (طاعة) বলে উল্লেখ করা হয়। ইবনুল আছীর বলেছেন, عبادة (এবাদত) এমন আনুগত্যকে বলা হয়, যাতে রয়েছে চূড়ান্ত পর্যায়ের আন্তরিকতা (ভালবাসা), বিনয় ও ভয়ভীতির আমেজ। (তাফসীরে ফাতহুল কাদীর)

'তাফসীরে খাজেন' এ উল্লেখ হয় عبادة(এবাদত) এমন এক বিশেষ কার্যের নাম; যার মাধ্যমে আল্লাহপাকের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের জন্য অপরিহার্যকৃত বিশেষ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

'তফসীরে তফসীরুর রহমান' এ উল্লেখ করা হয়- 'তছখীর' (تسخير) বা প্রেতাত্মা বন্দী করনের সাধনা বা হাসি-ঠাট্টার উদ্দেশ্যে সম্মান করা কিংবা বিনয় প্রকাশ করা, অনুরূপ সম্মান প্রদর্শনের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়া ও মাথা নত করা ইত্যাদি 'এবাদত' এর সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। যেমন- বর্ণিত হয়–

فَخَرَجَ التَّسْخِيْرُ وَالتَّسَخُّرُ وَالْقِيَامُ وَالْاِنْحِنَاءُ لِنَوْعِ تَعْظِيْمٍ.

অর্থাৎ ঃ 'সুতরাং (এবাদতের সংজ্ঞা থেকে) 'তাছখীর'(প্রেতাত্মা, জ্বীন ইত্যাদি বন্দী করনের সাধনা করা), হাসি-ঠাট্টা, সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং বিশেষ ধরনের সম্মান পূর্বক মাথানত করা বহির্ভুত হয়ে গেছে।

এখানে স্মর্তব্য যে, এমন বহু কাজ আছে, যেগুলো বাহ্যিকভাবে 'এবাদত' (عبادة) বলে মনে হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো এবাদতের সংজ্ঞা বহির্ভূত উপাসনার পর্যায়ে পড়ে না। উদাহরণ স্বরূপ, অনেকে কারো উপর 'তাছখীরের' প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে, এবাদতের কোনরূপ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে, এবাদতরূপ বহুকাজ করে থাকে। অনুরূপ, কেউ কেউ আবার

হাসি-ঠাট্টার ভঙ্গিতে এবাদতের রীতিনীতি পালন করে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী যে এদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত নয়, এদের এ বাহ্যিক কার্যাদিকে এবাদত বলে মনে করবে। কিন্তু বাস্তবে মাথানত করা অবশ্য এবাদতের অংশ বিশেষ– এতে সন্দেহ নেই। তবে এগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত এবাদতের শামিল হবে না যতক্ষণ না একাজগুলোতে এবাদতের প্রকৃত রূপ চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মান প্রদর্শন এর উদ্দেশ্য মুখ্য হয় বরং এগুলো হবে বিশেষ ধরনের সম্মান تَعْظِيْمِ اِضَافِيْ বা আপেক্ষিক সম্মান মাত্র।

'তাফসীরে মোয়ালেমুত্তানজীল' এ বর্ণিত– কুরআন পাকের যেখানে عِبَادَةٌ (এবাদত) এর উল্লেখ রয়েছে সেখানে এর অর্থ হচ্ছে 'তাওহীদ' বা আল্লাহর একত্ববাদ।

কাজেই, 'আবদ' (عَبْدٌ) শব্দটা হয়ত 'এবাদত' (عِبَادَةٌ) থেকে উদ্ভূত। তখন এর অর্থ হবে 'আবেদ' (عَابِدٌ) বা উপসনাকারী; নতুবা عُبُوْدَةٌ (য়ুবুদ্‌ত) থেকে।। তখন এর অর্থ দাড়াবে 'আব্‌দ হওয়া'। আর 'আবদ' ও এ অর্থে যে, চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও স্বীয় অসাহয়তা প্রকাশ করে। আর উল্লেখ্য যে, চূড়ান্ত বিনয় প্রকাশ পাবে যখন বিনয়ী নিজেকে স্বীয় প্রতিপালকের বান্দা এবং প্রতিপালককে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও নিজেকে তাঁরই সৃষ্টি বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। এ নিয়ত ব্যতিরেকে কোন এবাদতরূপী কাজকে এবাদত বলা যাবে না।

আমাদের মুনিব প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর খাঁটি বান্দা, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের শান ও মাহাত্ম্যের প্রকাশ পেয়েছে। এজন্যই হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে 'আবদুহু' (তাঁরই বান্দা), 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহর বান্দা) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুরআন করীমের মত মহান অনুগ্রহ (نعمت) হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এনেছেন। আব্‌দ বা বান্দার কাজ হলো স্বীয় মুনিবের পক্ষ থেকে আনয়ন করা। কাজেই যেখানে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে 'আব্‌দ' বলে এরশাদ হয়েছে সেখানে

نَزَّلَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ

ইত্যাদি শব্দ এরশাদ হয় যেখানে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর দান করার কথা উল্লেখ করা হয় সেখানে তাঁকে 'রছুল' ইত্যাদি হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে–

مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ – الاٰية

অর্থাৎঃ 'রছুল' তোমাদেরকে যা দান করেন– 'আল আয়াত' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর 'আবদিয়াতের' মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের 'রাবূবিয়াত' এর প্রকাশ পায়। আর আমরা (সাধারণ মানুষ) কখনো স্বীয় 'নফস' (রিপু-কুপ্রবৃত্তি) এর বান্দা হয়ে বসি; কখনো শয়তানের বান্দা হয়ে পড়ি, আবার কখনো হই দিনার-দিরহাম তথা টাকা-পয়সার গোলাম।

অনুরূপ, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর প্রতিটি কার্য্য আল্লাহর রাবুবিয়াত এর সন্ধান দান করে। কাজেই, 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহর বান্দা) হওয়া হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর এক মহান গুণ। (লোগাতুল কোরআন)

কুরআন মজীদে 'আব্দ' চার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা– ১. মখলুক (সৃষ্ট)ঃ যেমন এরশাদ হয়েছে–

عِبَادًا لَّنَا اُوْلِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ

অর্থাৎঃ '(আমি প্রেরণ করেছি) আমার 'আব্দ' বা মাখলুকদেরকে, যারা যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী।'

২. মাখলুকঃ যেমন مِنْ عِبَادِكُمْ

অর্থাৎঃ 'তোমাদের আব্দ বা মাখলুক হইতে'।

৩. ফানা ফিল্লাহ্ (আল্লাহতে বিলীন)ঃ যেমন– اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ অর্থাৎ 'তিনি (আল্লাহ) তাঁর খাস বান্দাকে রাতারাতি ভ্রমণ করায়েছেন।'

৪. মুতিহ্ঃ যেমন اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا নিশ্চয়ই তিনি (হযরত নুহ) হলেন একজন কৃতজ্ঞ বান্দা।

স্মর্তব্য যে, মখলুকের সব চাইতে বড় পূর্ণতা হলো 'আবদিয়াত' (বান্দা হওয়া)।এজন্যই কলেমা-এ-শাহাদতে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ তাঁর খাস বান্দা ও তাঁর রছুল। (তফসীরে নঈমী)।

'তাজুল আরুছ' এ উল্লেখ হয় "عُبُوْدَة" মানে হলো– প্রতিপালক (আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন) যা করেন তার উপরই সন্তুষ্ট থাকা। প্রথমোক্তটা (عِبَادَة) অতীব মেহনতলব্ধ বা কষ্টসাধ্য কাজ। এজন্যই 'আলমে আখিরাতে' এটা রহিত করে দেয়া হবে, কিন্তু عبودة (য়ুবুদত) দস্তুর মোতাবেকই বহাল থাকবে। কেননা এর মাহাত্ম্য হলো, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই আসল কার্য নির্বাহ কারী বলে বিশ্বাস করা। রূপকার্যে তো (مجاز) মখলুকও আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি দ্বারা (কার্যনির্বাহকারী) হতে পারে।

'কামুছ' এ বর্ণনা করা হয়– 'আবদ' (সাধারণতঃ) মানবকেই বলা হয়; আজাদ হোক কিংবা গোলাম হোক। 'তাজুল আরূছ প্রণেতার মতে 'আবদ' হলো– সে সৃষ্টিকর্তারই প্রতিপালিত হয়। আবার 'আবদ' মানে 'গোলাম'ও হতে পারেন যা 'আজাদ' এর বিপরীতার্থক।

আরবী ব্যাকরণ 'ছীবোয়াইহ্ ' (سيبويه) বলেছেন– 'আবদ' (عبد) আসলে গুণবাচক শব্দ (صفت) । যেমন, আরববাসীগণ বলে থাকেন– رَجُلٌ عَبْدٌ (অর্থাৎ এমন এক ব্যক্তি, যার অন্যতম গুণ বা বৈশিষ্ট্য হলো– সে একজন আবদ বা বান্দা)। কিন্তু তা বিশেষ্য (Proper Noun) হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

তফসীরে মায়ালেমুত্তন্জীলে উল্লেখ করা হয়– আব্দকে তার আনুগত্য ও বিনয়ের জন্যই 'আবদ' বলা হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে, যেখানে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে 'আবদুল্লাহ'(عَبْدُ اللّٰهِ) বলে এরশাদ হয়েছে সেখানে এর অর্থ হবে– তিনি (হুজুর দঃ) হলেন, আল্লাহপাকের 'কামেল' বা 'পরিপূর্ণ বান্দা। কেননা, নিয়ম (قاعدہ) রয়েছে, কোন স্বাধীন ও শর্তহীন শব্দকে স্বাধীন ও শর্তহীন (مطلقا) ব্যবহৃত হয় তখন তা পরিপূর্ণ ব্যক্তি বা বস্তুকেই বুঝায়। কোরআন মজীদে এ শব্দটা (আবদুহু বা আবদুল্লাহ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য নবীগণের বৈশিষ্ট্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– একেতঃ হযরত ঈসা

রূহুল্লাহ (আঃ) সম্পর্কে, হয়তঃ হুজুর ছৈয়্যদুল মোরছালীন মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম সম্পর্কে। উল্লেখ্য যে, 'আবদিয়াতে কামেলাহ্' বা পরিপূর্ণ বান্দা হওয়ার মহান বৈশিষ্ট্য বা গুণ নবীগণ (আঃ) ব্যতীত কাদের জন্যই অধিকতর শোভা পাবে? পৃথিবীতে কে আছে যে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর 'আবদিয়াত' কে অস্বীকার করতে পারে? তবে বিবেচ্য বিষয় হলো 'আব্দ' এর অর্থ নিছকভাবে 'দাস' বলা ঠিক হবে কি না? আসলে 'আবদ' শব্দের অর্থ এককভাবে 'দাস' বলা হবে সুস্পষ্ট ভুল, অর্থে বিকৃতি এবং মূর্খতা বৈ আর কি? কেননা 'আবদ' মানে গোলাম এর স্থলে 'দাস' এর ব্যবহার যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় তবুও এ শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, 'মামলুক' (ক্রীতদাস) ও স্বীয় অনুগতকেই আরবী পরিভাষায় গোলাম (غـــلام) বলা হয়। আর এর সমার্থক হলো হিন্দী (সংস্কৃত) ভাষায় 'দাস'। কিন্তু 'আবদ' এর প্রকৃত অর্থ তাই নয়। এর মূল অর্থ হল "عـــابد" (আবেদ), যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আবদ' শব্দটা 'আবেদ' বা উপসনাকারী ও গোলাম উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু হিন্দু ভাষায় 'দাস' শব্দটা ব্যবহৃত হয় শুধু 'গোলাম' শব্দের সমার্থক হিসেবে, (আবেদ, অর্থের সমার্থক হিসেবে নয়) কাজেই সে দৃষ্টিকোণ থেকে, যেখানে 'আবদুহু' (আল্লাহপাকের আব্দ) কিংবা 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহর আব্দ) এরশাদ হয়েছে সেখানে 'আবদ' (عـــبد) এর অর্থ 'দাস' বলা মোটেই সমীচীন হবে না, শোভাও পায় না। তদুপরি 'দাস' শব্দের অর্থে পরিপূর্ণতা জ্ঞাপক গুণের অনুপস্থিতিই বুঝায়। অথচ عَـبْـدُهٗ (আবদুহু) শব্দটা হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর এক মহান বৈশিষ্ট্য বা গুণ হিসেবেই কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে। (এবং হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে এ শব্দটার ব্যবহার তাঁর বৈশিষ্ট্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে)। পক্ষান্তরে, 'দাস' শব্দে সে বৈশিষ্ট্য বা গুণের অর্থটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যেমন, 'আবেদ' এবং 'গোলাম' শব্দদ্বয়ের মধ্যেকার পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে এটা সহজে অনুমান করা যায়। অর্থাৎ যেই কামালিয়াত ও বৈশিষ্ট্য عَـــابِدٌ (আবেদ)

শব্দের অর্থে প্রকাশ পায় 'গোলাম' নামের অধিকারীর মধ্যে তা' মাটেই পাওয়া যায় না। কারণ, হিন্দী ভাষায় 'দাস' শব্দের সমার্থক হলো 'গোলাম'; 'আজাদ' শব্দের বিপরীতার্থক। তাছাড়া, প্রকৃত 'আবেদ' নামের অধিকারী সত্ত্বার মধ্যে খোদা প্রদত্ত পরিপূর্ণতার সব ধরনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সমাবেশ হতে পারে। হুজুর ﷺ হলেন আবদিয়াতের পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কাজেই যেই ব্যক্তি عبد (আবদ) এর রূপক অর্থ (معنى مجازى) গ্রহণ করে কিংবা তুচ্ছার্থক শব্দ (দাস) গ্রহণ করবে তবে মারাত্মক ভুল হবে। এ ভুল তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকেও অপমানিত করার সম্ভাবনাই প্রকট। কেননা হুজুর ﷺ কে পরম শ্রদ্ধাভরে, সম্মানসূচক নিয়মে স্মরণ করা প্রতিটি ঈমানদারের জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত, যেই 'আবদ' (عبد) এর সম্পর্ক (منسوب اليه) মাখলুকের সাথেও হতে পারে। কিন্তু যখনি 'আবদ' এর মানে 'আবেদই' প্রযোজ্য হয় তখন সে 'আবদ' এর সম্পর্ক হয় শুধু আল্লাহ পাকের সাথে। (অর্থাৎ দাস বা গোলাম হয় মানুষের জন্য আর 'আবেদ' হয় শুধু আল্লাহর জন্যই)।

ইমাম রাগেব (রহঃ) 'আল-মুফ্‌রাদাত' এ 'আবদ' শব্দের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। আমার 'আল বয়ানুল মোছাফ্‌ফা নামক পুস্তকে আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠকবৃন্দ আমার উক্ত পুস্তকখানা পর্যালোচনা করতে পারেন।

হুজুর ﷺ কে 'আবদুল্লাহ' (عَبْدُ اللهِ) উপাধি স্বয়ং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই প্রদান করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে –

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

অর্থাৎঃ 'আর এই যে, যখন 'আবদুল্লাহ [আল্লাহর খাস বান্দা হযরত মুহাম্মদ ﷺ]তাঁহাকে ডাকতে দাড়ায়,তখন তারা (ভিড়ের কারণে) তাঁর নিকট ঠাসাঠাসি হয়ে পড়বার উপক্রম হলো। এ'তে খোদ আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুবকে 'আবদুল্লাহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আবূ আলী (বফাক্ব (রহঃ) উল্লেখ করেছেন, মু'মিনের জন্য عبودية (উবুর্দিয়াত) এর

চাইতে অধিক পরিপূর্ণ ও মহৎ গুণ অন্য কিছু হতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান সমূহে স্বীয় মাহ্বুবের জন্য এ শব্দটার (عبد) ব্যবহার করেছেন।

মেরাজ শরীফ হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর এক অনুপম মোজেজা। পবিত্র মেরাজের বর্ণনায় এরশাদ হয়েছে–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا (الآية)

অর্থাৎঃ 'পবিত্রতা সেই মহান আল্লাহর; যিনি তাঁর খাস বান্দা (عبد) কে উর্ধ্বলোকে রাতারাতি ভ্রমণ করায়েছেন।

কোরআন প্রদান প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

অর্থাৎঃ 'সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য; যিনি তাঁর 'বান্দার প্রতি কিতাব [কোরআন মজীদ] অবতীর্ণ করেছেন।'

আরো এরশাদ হয়েছে–

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ

অর্থাৎঃ 'বরকতময় সেই মহান জাত; যিনি তাঁর বান্দার প্রতি 'ফোরকান' (কোরআন করীম) নাজিল করেন।'

ওহী প্রেরণ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে–

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَااَوْحٰى

অর্থাৎঃ 'কাজেই তিনি তাঁর 'বান্দার' প্রতি ওহী নাজিল করেছেন; যা ওহী হিসেবে নাজিল হবার যোগ্য।'

লক্ষ্যণীয় যে, ضمير متصل বা 'সংযুক্ত সর্বনাম' সহকারে عَبْدُهٗ শব্দটা পবিত্র কোরআন মজীদে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ব্যতীত মাত্র একজন নবীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে শুধু একটা স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানটি হলো সূরা মরিয়মের প্রারম্ভ এবং সেই মহা মর্যাদাবান নবী হলেন হযরত যাকারিয়া (আঃ)।

যেমন এরশাদ হয়েছে–

(দঃ) رَحْمَتُ ذِكْرِ رَبِّكَ عَبْدَه زَكَرِيَّا

অর্থাৎঃ অন্য সব জায়গায় (আয়াতে) عبد বা পরিপূর্ণ বান্দা একমাত্র হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানেই এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখিত। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে– কোরআন মজীদের যেখানে হুজুর (সাঃ)কে عبده (আবদুহু) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে সেখানে তা (عبده) অবিশ্লেষিতই (مبهم) রাখা হয়েছে। কিন্তু যেখানে 'আবদুহু' عَبْدُهٗ দ্বারা হযরত যাকারিয়া আলাইহিমুচ্ছালামের কথা বুঝানো হয়েছে সেখানে এর পর পরই তাঁর নামও ব্যক্ত করা হয়েছে; যেন আল্লাহ পাকের 'আব্‌দ' বা বান্দা হযরত যাকারিয়া (আঃ) এবং তাঁর (আল্লাহর) 'খাস বান্‌দা' হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মর্যাদা ও মহত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশিত হয়। অর্থাৎ 'আবদুহু যাকারিয়া' অপেক্ষা 'আবদুহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অধিকতর মর্যাদাবান, মহত্বর এবং অধিকতর কামিল বা পরিপূর্ণ। এ গুঢ় তথ্যটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। কলেমায়ে শাহাদতে عَبْدُهٗ ও رَسُوْلُهٗ এ দু'টি যুক্ত শব্দের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎঃ 'রেছালতরূপ মহান বৈশিষ্ট্যের সাথে অপর এক বৈশিষ্ট 'আবদিয়াত' (বান্দা হওয়া)এর স্বীকৃতি রয়েছে।এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আবদিয়াতের মধ্যে মর্যাদাবান মা'বুদ ও মাওলা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে গ্রহণ করার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

(আল্লাহ পাক তাঁর খাস বান্‌দা মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর প্রতি কিতাব (কোরআন) নাজিল করেছেন,

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ

(অর্থাৎঃ সেই বরকতময় জাত যিনি ফোরকান নাজিল করেছেন)

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى

(অতঃপর তিনি আপন বান্দার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন) আর অন্যতম বৈশিষ্ট্য 'রেছালত' এর মধ্যে মাখলুক বা সৃষ্টিকে দান করার ইঙ্গিত প্রতিভাত হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে–

(الآية) مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ অর্থাৎঃ রাছূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তোমাদেরকে যা প্রদান করেন। অন্য আয়াতে এরশাদ হয় أَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ (অর্থাৎঃ তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সমৃদ্ধিশালী করেছেন) ইত্যাদি।

শেখজাদা প্রণীত 'আল্ হাশিয়া আলাল বয়জাবী' সহ বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করা হয়।

قَالَ عَلٰى عَبْدِهٖ دُوْنَ نَبِيِّهٖ وَرَسُوْلِهٖ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّ الْعُبُوْدِيَّةِ اَجَلُّ صِفَاتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَشْرَفُهَا وَذَالِكَ لِاَنَّ اَشْرَفَ مَاسِوَى الْعُبُوْدِيَّةِ مِنْ صِفَاتِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِىَ الرِّسَالَةُ وَعُبُوْدِيَّةُ الرَّسُوْلِ لِكَوْنِهَا اِنْصِرَافًا مِنَ الْخَلْقِ اِلَى الْحَقِّ اَجَلُّ وَاَشْرَفُ مِنْ رِّسَالَتِهٖ لِكَوْنِهَا بِالْعَكْسِ فَاِنَّهَا اِنْصِرَافٌ مِنَ الْحَقِّ اِلَى الْخَلْقِ لِلتَّبْلِيْغِ اَحْكَامِ الْمُرْسِلِ.

অর্থাৎঃ আল্লাহপাক উপরোক্ত আয়াতে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সম্পর্কে এরশাদ করেছেন عَلٰى عَبْدِهٖ অর্থাৎ তাঁর (খাস) বান্দার উপর (কিতাব, ওহী ইত্যাদি নাজিল করেছেন); عَلٰى نَبِيِّهٖ (তাঁর নবীর উপর) কিংবা عَلٰى رَسُوْلِهٖ (তাঁর রছুলের উপর) ইত্যাদি এরশাদ করেননি। এ'তে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'আবদিয়াত' বা 'বান্দা' হওয়া হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ বা বৈশিষ্ট্য। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আরেক মহত্তর বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর 'রেছালত'। (বস্তুতঃ) 'রছুল' এর 'আবদিয়াত' (বান্দা) হওয়ার বৈশিষ্ট্য তাঁর 'রেছালত' (রছুল হওয়া) এর চাইতেও অধিকতর উত্তম বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং 'আবদিয়াত' এর মানে হয়– 'মাখলুক (সৃষ্ট) এর নিকট থেকে আল্লাহ পাকের (স্রষ্টা) দিকে যাওয়া। আর 'রেছালত' এর অর্থ হলো এর বিপরীত, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দা তথা মখলুকের দিকে আসা,

অর্থাৎ রছুল রেছালত সম্পর্কিত সব বিষয় সৃষ্টি পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া।

হ্যাঁ তবে এখানে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, রছুল নয় এমন কারো 'আবদিয়াত' কোন রছুলের 'রেছালত' অপেক্ষা অধিক উত্তম নয়, একথার কেউ বক্তাও নয়। কোরআন মজীদ যেমন সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে সর্বোত্তম তেমনি হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও মানব জাতির মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা, সর্বাধিক পূর্ণতা ও মহত্ত্বের অধিকারী।

মোদ্দা কথায়, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর গুণাবলীর মধ্যে রেছালতের তুলনায় তাঁর 'উবুদিয়াত' (বান্দা হওয়া) অধিকতর উত্তম বৈশিষ্ট্য। কেননা, (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে) 'আবদিয়াতে'র মধ্যে বান্দা থেকে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের (انصراف) অর্থ এবং 'রেছালত' এর মধ্যে আল্লাহর নিকট থেকে বান্দার দিকে অবতরণের অর্থ নিহিত রয়েছে। বস্তুতঃ গ্রহণ করার বেলায় আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা হয় বান্দা।

সুতরাং আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ গ্রহণের প্রেক্ষিতে হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র জাত হলো 'আবদ'। আর মখলুককে খোদার নিকট থেকে গৃহীত নেয়ামত বা অনুগ্রহ সমূহ প্রদান করার প্রেক্ষিতে তিনি হলেন 'রছুল' নবী। (সহজ ভাষায় হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র স্বত্ত্বা– আল্লাহর অনুগ্রহ গ্রহীতা হিসেবে 'আল্লাহর আবদ' (আল্লাহর খাস বান্দা) আর আমাদের দাতা হিসেবে তিনি রছুল; নবী)। কাজেই, কলেমায়ে শাহাদতে উল্লেখিত 'আবদুহু' ওয়া 'রাছুলুহু' এর অর্থ দাড়ায়– 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আল্লাহ পাকের নিকট থেকে ঈমান, ইসলাম ও কোরআন করীম গ্রহণ করেন আর আমাদেরকে সেই নেয়ামত (অনুগ্রহ) দান করেন।"

সুতরাং আল্লাহর দয়ালু হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে আল্লাহর রহমত সমূহের গ্রহীতা হিসেবে আবদ এবং সেসব নেয়ামতের দাতা হিসেবে রছুল উপাধি সহকারে সশ্রদ্ধ স্মরণ করাই হবে একান্ত যুক্তিযুক্ত ও বিবেক গ্রাহ্য।

তদুপরি, আমরা হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে 'আবদুহু' ওয়া রাছুলুহু' (عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ) বা 'আল্লাহর বান্দা ও রছুল' বলে এ দৃষ্টিকোণ থেকেও স্মরণ করতে পারি যে, এ দ্বীন ইসলাম ও কোরআন মজীদ হুজুর করীম হযরত

মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরই (বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রদত্ত ও ব্যক্ত অনুগ্রহরাজি কারো মনগড়া নয়। অর্থাৎ (হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর 'আবদিয়াত' এ মর্মে সমুজ্জ্বল সাক্ষ্যবহ যে) এগুলো (ইসলাম ও কোরআন মজীদ রূপ অনুগ্রহরাজি) সেই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহর পক্ষ থেকে; যাঁরই 'আবদ' বা খাস বান্দা হলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

এখনই উল্লেখ করা হয় যে, عَبْدُهٗ পদটা কোরআন করীম যে কোন মানব তথা সৃষ্টি রচিত গ্রন্থ নয়– এ কথার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। আর رَسُوْلُهٗ (রাছুলুহু) পদে আমাদের জন্য কোরআন মজীদ তথা হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম প্রদত্ত সমস্ত নির্দেশ গ্রহণ করার, মেনে চলার, তদানুযায়ী যথাযথ আমল করার নির্দেশ (ইঙ্গিত) রয়েছে।

অতএব, একথাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হলো যে, 'আল্লাহর আবদ' (বান্দা হওয়া) হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর এক শ্রেষ্ঠতর বৈশিষ্ট্য।

'আবদ' শব্দের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে 'দাস' ব্যবহার করা নিছক প্রলাপ, ভিত্তিহীন ও মনগড়া উক্তিরই নামান্তর মাত্র তা কোন সঠিক গবেষণালব্ধ অর্থ নয়। উদাহরণ স্বরূপ,

سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ (الآیة)

এ (যাতে মেরাজ শরীফের বর্ণনা রয়েছে) আল্লাহপাক হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে 'আবদ' বলে অভিহিত করেছেন। এর অন্যতম কারণ হলো হযরত ঈসা (আঃ)কে আসমানের উপর উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল বলে ঈসায়ী (খৃষ্টান) সম্প্রদায় তাঁকে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করতে থাকে (নাউজুবিল্লাহ)। আর বিশ্বনবী হুজুর কে উর্ধ্বলোকে মেরাজ শরীফে, (আসমান সমূহ, বেহেস্ত, দোযখ, আরশ, কুরসী ইত্যাদি) ভ্রমণ করানো হয়। এর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহপাক এরশাদ করেন اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) তাঁর খাস 'বান্দা' [হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম]কে রাতারাতি ভ্রমণ করায়েছেন।এখানে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে 'আবদ' বলে আখ্যায়িত করে 'শিরকের' একটা অধিকতর সম্ভাব্য পথকে কঠোরভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ 'আবদিহি' বলে

ওদিকে নির্দেশ করেছেন যে, খৃস্টানগণ যেমন আসমানে উর্ধ্বগমনের কারণে হযরত ঈসা (আঃ)কে খোদার পুত্র বলে অভিহিত করেছিল তেমনি যেন হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ঊর্ধ্বলোক ভ্রমণের কথা শুনে বিশ্বনবী হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য বা ধারণা পোষণ করার প্রয়াস না পায় যা সম্পূর্ণ ও নিরেট শিরকী ধারণার নামান্তর হবে। (তাই, আল্লাহ পাক যেমন এরশাদ করেন যাঁকে আমি ভ্রমণ করায়েছি তিনি হলেন আমারই খাস বান্দা, খোদা বা খোদার পুত্র নন) মোট কথা হুজুরকে আল্লাহ তায়ালা আব্‌দ বা 'বান্দা' নামে অভিহিত করা মোমিনদের জন্য তাঁরই মহান এহসান বা অনুগ্রহ।

কোন কোন তফসীরকার এ অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে, যখন রছুলে খোদা। ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে উচ্চ মর্যাদার সিংহাসনে সমাসীন করা হয় তখন আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করেন– 'হে আমার মাহ্‌বুব! বলুন তো, আপনাকে এ ধরনের উচ্চ মর্যাদা দান করার কারণ কি? তখন হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আরজ করেন, 'এসব মর্যাদা আমার 'উবুদিয়াত' বা আপনার বান্দা হওয়ার কারণেই আমি অর্জন করেছি।' তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে عَبْدُهٗ বা তাঁর খাস বান্দা উপাধিতে ভূষিত করেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে,আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে যেখানে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সম্পর্কে عَبْدُهٗ বা তাঁর 'বান্দা' এরশাদ করেছেন সেখানে অধিকন্তু তিনি (আল্লাহ) স্বীয় জাতে পাকের বর্ণনায় اَلَّذِیْ পদটা ব্যবহার করেছেন। এলমে নাহুর তথা আরবী ব্যাকরণ মতে, الذی পদটা ব্যাপকার্থক। অনুরূপ আব্‌দ শব্দটাও ব্যাপকার্থক (عـــــام) । একথাটা আরবী ব্যাকরণ শিক্ষার্থীদেরও সাধারণতঃ জানার কথা। 'আবদ' শব্দটা ব্যাপকার্থক (عـــــام) বলেই, আল্লাহর সমস্ত মখলুকই তাঁর আবদ বা বান্দা। যেমন, কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে–

اِنْ كُلُّ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِی الرَّحْمٰنِ عَبْدًا.

অর্থাৎঃ 'আসমানে ও জমীনে যত কিছু রয়েছে সবই তাঁর (আল্লাহ) সম্মুখে তাঁরই বান্দা হয়ে হাজির হবে' (সূরা মরিয়ম)। কিন্তু যিনি সমস্ত কামিল বা পরিপূর্ণ বান্দার মধ্যে সর্বাধিক কামিল পরিপূর্ণ বান্দা তিনি হলেন আল্লাহর মাহ্‌বুব হুজুর

করীম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। কেননা 'আবদুহু' (عَبْدُهٗ) মানে 'আল্লাহর বান্দা'। আর আল্লাহর বন্দেগীর সর্বাধিক পরিপূর্ণতা হলো আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য। বস্তুতঃ সেই নৈকট্য হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মেরাজ শরীফে লাভ করেছিলেন তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে কারো ভাগ্যে জোটেনি, জোটবে না, জোটতেও পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর সৃষ্ট সমস্ত বান্দার মধ্যে 'আব্‌দে কামিল' বা সর্বাধিক কামিল বা পরিপূর্ণ স্বত্ত্বা হলেন একমাত্র হুজুর করীম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। তাছাড়া, اَلَّذِیْ ও عَبْدُهٗ উভয় শব্দ অস্পষ্ট অর্থ জ্ঞাপক (مبهم)। একথার প্রতি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, যেমন আল্লাহ্ পাকের حسن ذاتی বা সত্বাগত সৌন্দর্য সমস্ত সৃষ্টি থেকে লুকায়িত, তেমনি তাঁর হাবীব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র ও বরকতময় স্বত্ত্বার প্রকৃত সৌন্দর্যের পূর্ণরূপও সৃষ্টির চক্ষুর অন্তরাল রাখা হয়েছে। (দুর্‌রাতুত্ তাজ)।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর নিকট থেকে তাঁর নেয়ামতের গ্রহিতা অনুসারে তিনি আল্লাহর আব্‌দ বা বন্দা এবং সেই গৃহিত অনুগ্রহ সৃষ্টিকে প্রদানকারী হিসেবে তিনি হলেন আমাদের 'রছুল'। কাজেই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও (হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে ব্যবহৃত) 'আবদ' (عبد) মানে 'দাস' হতে পারে না।

আমরা তথা সাধারণ মানুষ 'আব্‌দ' বা 'বান্দা', তবে আমাদের আবদিয়াতের কৃত্রিমতার আমেজ রয়েছে বেশী। আমরা সাধারণ মানুষ ও 'আবদুল্লাহ' বা 'আল্লাহর বান্দা' তবে আমরা 'আল্লাহর বান্দা' হওয়ার কথা আমরা নিজেরাই দাবী বা ঘোষণা করে থাকি। কিন্তু হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম 'আল্লাহর আব্‌দ' বা তাঁরই খাস বান্দা হওয়ার ঘোষণা বা সনদ প্রদান করেন খোদ আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং এতেও একথা প্রমাণিত হয় যে, আমরা সাধারণ মানুষের আবদিয়াত এবং হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর 'আবদিয়াত' এর মধ্যে অভাবনীয় পার্থক্য রয়েছে।

অনুরূপভাবে (যেহেতু 'আবদ' শব্দের রূপকার্য হয় গ্রহিতা, সেহেতু) আমরা

যখন হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে দ্বীন, ঈমান, ইসলাম ও কোরআন মজীদ ইত্যাদি মহান অনুগ্রহ সমূহ লাভ করে ধন্য হয়েছি তখন আমরাও হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম -এর আব্‌দ সকল। আর এ অর্থেই আমাদের নাম 'আবদুর রছুল', আবদুল মোস্তফা, ও 'আবদুন্নবী' ইত্যাদি হওয়া যুক্তিসঙ্গত। তখন আবদ মানে হবে গোলাম (রূপকার্থে) 'আবদে হাক্বীক্বী' বা এবাদতকারী অর্থে অবশ্যই নয়। এ পার্থক্যটা এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, নতুবা ধোকা বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার সম্ভাবনাই প্রকট। এ পার্থক্যের ভিত্তিতেই আমাদের পূর্ববর্তী যুগীয় সুদক্ষ আলেমগণের মধ্যেও অনেকের নাম 'আবদুন্নবী' আবদুর রছুল' ইত্যাদির প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব 'কাফিয়াহ'র ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'জামেউল গুমুছ' এবং 'দস্তুরুল ওলামা' ইত্যাদি প্রণেতার নামও ছিল আবদুন্নবী আর তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুর রছুল। সর্বজন স্বীকৃত প্রসিদ্ধ কিতাব 'দুররুল মোখতার' প্রণেতার ওস্তাদের নাম ছিল 'আবদুন্নবী'। গোলাম রছুল, গোলাম নবী ইত্যাদিও অনুরূপই। এ নামগুলোর অর্থ হচ্ছে রছুল পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর গোলাম। তাছাড়া, হাজার হাজার সুদক্ষ আলেমের নাম আবদুন্নবী, আবদুর রছুল ছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমার লিখিত 'আল বয়ানুল মোছাফ্‌ফা' পড়ুন।

এখানে সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিকক্রমে এতটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি যে, আল্লাহ পাক এরশাদকরেন مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রছুলের গোলাম হবে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহরই গোলাম। সূরা 'নূর' এ এরশাদ হয়েছে وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ অর্থাৎঃ 'তোমাদের আব্‌দগণের মধ্য থেকে সৎ ব্যক্তিগণ'..। সুতরাং এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, আব্‌দ শব্দের সম্পর্ক (نسبت اضافت) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো প্রতি করা শিরক নয়। কারণ যদি তাই হত তবে আল্লাহপাক مِنْ عِبَادِكُمْ (তোমাদের আবদ বা গোলামদের মধ্য থেকে) অবশ্যই এরশাদ করতেন না। কাজেই, যখন আল্লাহ পাক 'আবদ' শব্দটা আপন স্বত্ত্বা ব্যতীত অন্যের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন তখন এ নিয়মের বিরোধিতা কে করতে পারে?

'এমদাদুল মোস্তাক' ৯৩ পৃষ্ঠায় হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী ছাহেব উল্লেখ করেছেন, যেহেতু হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর নৈকট্যেই অর্জন প্রাপ্ত সেহেতু 'এবাদুল্লাহ' বা আল্লাহর বান্দাদেরকে 'এবাদুর রছুল' বা রছুলের বান্দা কিংবা গোলাম বলা যাবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎঃ হে হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম !আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা .....)। এখানে عِبَادِىْ (আমার বান্দাগণ) বচনে "ى" (আমার) ضمير (সর্বনাম)টা দ্বারা হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-কে বুঝানো হয়েছে (অর্থাৎ হে প্রিয় নবীর বান্দাগণ!) মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ছাহেব উক্ত অভিমতের সমর্থনে বলেছেন– আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গীও (قرينه) উক্ত অর্থের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন এর পরপরই এরশাদ হয়েছে– لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রহমত (অনুগ্রহ) থেকে নৈরাশ হবে না।' কাজেই প্রথমোক্ত সর্বনাম "ى" (আমার) এর মানে যদি আল্লাহ হতো তবে এখানে مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ (আল্লাহর রহমত থেকে) এর স্থলে مِنْ رَّحْمَتِىْ (আমার রহমত থেকে) এরশাদ করা হতো। কারণ তখনই "عِبَادِىْ" এর সাথে "رَحْمَتِىْ" এর মধ্যেকার সামঞ্জস্য বিধান হতো।

'কন্‌জুল ওম্মাল' ৩য় খণ্ড ১৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে

فَلَمَّا وُلِّىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُوْنِسُوْنَ مِنْ شِدَّةٍ وَغِلْظَةٍ وَذٰلِكَ اِنِّىْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ.

অর্থাৎঃ সুতরাং যখন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) খলীফা হন তখন জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি খোৎবা (ভাষণ) দিয়েছিলেন। তিঁনি রছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মিম্বরের উপর আরোহন করে (প্রারম্ভে) আল্লাহর প্রশংসা (হাম্‌দ ও ছানা) বর্ণনা

করেন, তারপর তিনি বললেন, ওহে জনতা, আমি জানি যে, তোমরা আমাকে গভীরভাবে ভালবাস। আর তাও এজন্য যে, আমি রছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সঙ্গেই ছিলাম এবং আমি হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর 'আবদ' বা গোলাম এবং তাঁর খাদেম।'

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) যখন নিজেকে 'আবদুর রছুল' বা রছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর গোলাম বলে মিম্বর শরীফে আরোহন করেই ঘোষণা করেছেন। তখন 'আবদুর রছুল' ইত্যাদি নামে নামকরণ করা সে আবার কোন্ শরীয়তে নিষিদ্ধ?

আমি পুনরায় আমার মূল আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর 'আবদিয়াত' এবং অন্যান্য মাখলুকের আবদিয়াতের মধ্যে আসমান জমীন সমতুল্য পার্থক্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গেই আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

عبد دیگر عبده چیزے دیگر + او سراپا انتظار ایں منتظر .

অর্থাৎঃ নিছক 'আব্‌দ' শব্দের অর্থ এক, কিন্তু 'আবদুহু' "ہ" সর্বনাম বিশিষ্ট এর অর্থ ভিন্ন। অর্থাৎ 'আবদ' তো আপাদমস্তক খোদার নৈকট্য ও দীদার লাভের জন্য অপেক্ষারত আর যিনি 'আবদুহু' তাঁর জন্য তো খোদ্ খোদা অপেক্ষায় রত। অন্যত্র বলেছেন–

جگنوں بھی ایك پتنگا پروانه بھی ایك پتنگا

یه روشنی کا طالب وه سراپا روشنی.

অর্থাৎঃ 'জোনাকী যেমন একটা পতঙ্গ তেমনি প্রজাপতিও একটি পতঙ্গ। আর প্রজাপতি হলো আলোর সন্ধানে আত্মহারা; আর জোনাকী আপাদমস্তক আলোকই।

সুতরাং জনাবে মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আবদিয়াতের শান বা মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশ ঘটে মহান মে'রাজ শরীফের ঘটনা থেকে।

আমার পরম সম্মানিত ওস্তাদ ও মুর্শিদ, গাজ্জালীয়ে জমান যুগের রাজী, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ, হযরত আল্লামা আলহাজ্ব ছৈয়দ আহমদ ছায়ীদ কাজেমী

শাহ ছাহেব কেবলা (রহঃ) স্বীয় স্বনামধন্য কিতাব 'মাক্কালাহ্-ই-মেরাজুন্নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তে আবদুহু (عَبْدُهٗ) এর অতীব উন্নত মানের বিশ্লেষণ(تحقیق) করেছেন। আমি তা নিম্নে পাঠক ভাইদের খেদমতে পেশ করছি; যাতে তাঁরা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারেন–

'পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেখানে আল্লাহ পাক স্বীয় মাহ্বুবকে 'আবদুহু' (তাঁর বান্দা) বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেখানে তিনি আপন সত্ত্বার বর্ণনা الذی দ্বারাই দিয়েছেন। এর রহস্য হলো আল্লাহপাক এ ধরনের আয়াত সমূহে যেমন নিজের নাম উল্লেখ করেনি; তেমনি স্বীয় মাহবুবের নামও উল্লেখ করেননি; বরং আল্লাহপাক স্বীয় স্বত্ত্বার বর্ণনা الذی দ্বারা এবং স্বীয় মাহবুবের ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পরিচয় عَبْدُهٗ (আবদুহু বা তাঁর খাস বান্দা) দ্বারাই দিয়েছেন। আরবী ব্যাকরণ মতে اَلَّذِیْ হল اسم موصول । এর অর্থ হলো সেই জাত বা স্বত্ত্বা। এটা এমন একটা শব্দ যা প্রত্যেক বস্তুর জন্যই ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎঃ প্রত্যেক বস্তুকে اَلَّذِیْ দ্বারা বিশেষিত করা যায়। 'আবদ' শব্দটাও অনুরূপ। অর্থাৎঃ আল্লাহ পাক ব্যতীত প্রতিটি সৃষ্টিই ممکنات তথা তাঁর 'আবদ' বা বান্দা। এ'তে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু এখানে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, মোদ্দাকথায়, আল্লাহপাক স্বীয় স্বত্ত্বা এবং হাবীবের জন্য এমন দু'টো শব্দ এরশাদ করেছেন যেগুলোর ব্যবহার সমস্ত সৃষ্টির বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে। অর্থাৎঃ সব اَلَّذِیْ এবং সব সৃষ্টিই عَبْدٌ (আবদ বা বান্দা)। এখানে মূলতঃ রহস্য হলো এই যে, اَلَّذِیْ (সে-ই স্বত্ত্বা) তো সব কিছুর স্বত্ত্বাই কিন্তু যে-ই স্বত্ত্বাকে 'পূর্ণতম' অর্থে বিশেষিত করা যাবে তিনি হলেন একমাত্র সে মহান স্বত্ত্বা যিনি اَسْرٰی (ঊর্ধ্বলোকে ভ্রমণ করান), اَنْزَلَ (অবতীর্ণ করেন) এবং نَزَّلَ (নাজিল করেন) ইত্যাদি ক্রিয়া সমূহের ক্রিয়ার 'কর্তা' (فَاعِلٌ) কেননা, اَلَّذِیْ মানে হলো وہ ذات (সেই স্বত্ত্বা)। আর একথাই সর্বজন স্বীকৃত যে, 'পূর্ণতম' ও চিরস্থায়ী স্বত্ত্বা, (وجوب ذاتی) , খোদায়ী (الوھیت) এবং সর্বশক্তিমত্ত্বা (قُدْرَتِ کَامِلَہ) ইত্যাদি গুণের

অধিকারী 'জ্বাত' বা 'স্বত্ত্ব' আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে না, হওয়ার কল্পনাও করা যায় না।

বস্তুতঃ প্রত্যেক আব্‌দ (উপাসক) তথা সমস্ত ক্ষণস্থায়ী স্বত্ত্বা মহান চিরস্থায়ী স্বত্ত্বার (আল্লাহর)ই মাখলুক, অধিনস্থ ও উপাস্য। প্রত্যেক মকদুর (مقدور) বা আল্লাহ্‌র কুদরতাশ্রিত সর্বশক্তিমান স্বত্ত্বা (قَادِرِ مُطْلَقْ) খোদা তায়ালারই কুদরতের আওতাভুক্ত। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, চিরস্থায়ী স্বত্ত্বা (واجب بالذات) ও প্রকৃত উপাস্য (مَعْبُوْدِ بَرْحَقْ) আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ নয়। কাজেই الذی (সেই স্বত্ত্বা) দ্বারা নির্দেশিত 'একমাল' বা পূর্ণতা' স্বত্ত্বা শুধু আল্লাহই হবেন নিঃসন্দেহে। আর খোদা তায়ালার সেই মহান স্বত্তার পরিপূর্ণতার (كمال) প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ হলো اَسْرٰی (তিনি উর্ধ্বলোকে তাঁর হাবীবকে ভ্রমণ করান) ক্রিয়াটি। কেননা মেরাজ শরীফে ভ্রমণ করানো قدرت كامله বা সর্বশক্তিমত্ত্বা সম্পন্ন 'জ্বাত' ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। (অনুরূপভাবে, কোরআন মজীদ নাজিল করা) আর প্রকৃত উপাস্যের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হলো– চিরস্থায়িত্ব وجوب ذاتی আর এ চিরস্থায়িত্বই হলো اَلَّذِیْ বা 'সেই স্বত্ত্বার পূর্ণতা।

একথা স্মর্তব্য اَلَّذِیْ পদটা হলো অর্থ নির্দেশক (دال), আর পূর্ণতার অধিকারী স্বত্ত্বা (আল্লাহ্‌পাক) হলেন উক্ত اَلَّذِیْ পদের নির্দেশিত অর্থ বা 'জ্বাত' (مدلول)। (পূর্বের বর্ণনানুযায়ী) উক্ত পদটা (دال) (ব্যবহার গত দিক দিয়ে) সমস্ত সৃষ্টির বেলায়ই প্রযোজ্য হওয়া রহস্যের দিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, সে পদ নির্দেশিত মহান স্বত্ত্বা আল্লাহপাক (مدلول) সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি অণুপরমাণুকে স্বীয় কুদরতের আওতাভুক্ত রেখেছেন। যেমন এরশাদ করেছেন– وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ مُّحِيْط অর্থাৎঃ তিনি সমগ্র সৃষ্টির সব কিছুকেই স্বীয় কুদরতের আওতায় ঘিরে রেখেছেন।

এর উপর অনুমানের ভিত্তিতে, 'আব্‌দ্‌' (عبد) বলতেও প্রত্যেকটি জিনিষকে

বুঝায়। আল্লাহ তায়ালার সমস্ত মখলুক তাঁরই 'আব্‌দ' বা বান্দা। কিন্তু যাঁকে সমস্ত কামিল বান্দার মধ্যে ও সর্বাধিক কামিল বা পরিপূর্ণতম বান্দা বলা যেতে পারে তিনি হচ্ছেন সেই পবিত্র স্বত্ত্বা যিনি اَسْرٰى ক্রিয়ার مفعول به (فعل) বা কর্ম এবং যাঁকে اَسْرٰى তথা মে'রাজ শরীফের বর্ণনা সম্বলিত আয়াতে عَبْدُهٗ (আবদুহু বা তার বান্‌দা) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এর দলীলও হলো اَسْرٰى ক্রিয়া- পদটা যার مفعول به বা কর্মপদ হচ্ছে عَبْدُهٗ বা এ পবিত্র বান্দা। কেননা 'আব্‌দুহু' মানে হলো– আল্লাহ্‌র বান্‌দা। আল্লাহর বন্দেগীর সবচেয়ে বৃহৎ পূর্ণতা হলো– আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য। اَسْرٰى তথা মে'রাজ শরীফে সে পবিত্র বান্দা আল্লাহ পাকের যে-ই নৈকট্য অর্জন করেছেন; 'কা'বা-ক্বাওছাইন' (বা দু'টি সংযুক্ত ধনুকের ন্যায় বরং তদাপেক্ষাও অধিকতর নৈকট্য) এর যেই মর্যাদা তিনি হাসিল করেছেন সেই মহা 'মর্যাদা' ও নৈকট্য আজ পর্যন্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের কারো ভাগ্যে জোটেনি, জোটবেও না এবং জোটতেও পারে না। কাজেই আল্লাহ্‌ তায়ালার সমস্ত বান্দার মধ্যে 'আবদে কামিল' বা পরিপূর্ণ বান্দা হলেন একমাত্র 'আবদুহু' বা তাঁরই (আল্লাহ তায়ালার) সেই খাস বান্দা। একথাই এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট।

মোটকথা হলো সবারই বেলায় যেমন اَلَّذِىْ পদটা ব্যবহার করা যায়, কিন্তু কামিল اَلَّذِىْ হলেন একমাত্র চিরস্থায়ী স্বত্ত্বা আল্লাহ তায়ালা, তেমনি عَبْدٌ (আব্‌দ) সবই; কিন্তু কামিল বা পরিপূর্ণ عَبْدٌ(আবদ) বা বান্দা হলেন একমাত্র হযরত মোহাম্মদুর রছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম । 'আবদ' শব্দটা হচ্ছে دال বা অর্থ নির্দেশক শব্দ এবং কামিল উবুদিয়াত সম্পন্ন বা পরিপূর্ণ বান্দা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন مدلول বা সেই 'শব্দ' নির্দেশিত অর্থ। دال বা অর্থ নির্দেশক শব্দটা (عبد) এমনি ব্যাপকার্থক হওয়া যে, তা সমগ্র বিশ্বকেই শামিল করে নেয় (অর্থাৎ বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর বেলায় 'আবদ' শব্দের ব্যবহার প্রযোজ্য হওয়া) একথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, مدلول বা 'আবদ' বলতে যাঁকে বুঝানো হয়েছে এমনি এক স্বত্ত্বা, যাঁর দান তথা বদান্যতার ব্যাপকতায় প্রভাবাধীনে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিই শামিল রয়েছে

(অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য সেই মহান 'আবদ' দাতা) যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎঃ 'হে হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত বা কল্যাণ করেই প্রেরণ করেছি।' কাজেই اَلَّذِىْএবং عــبــد উভয় পদই সমস্ত সৃষ্টিকে শামিল করে নেয়া একথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, সমগ্র জগত হলো اَلَّذِىْ এবং عَــبْــدُهٗ আল্লাহ ও তাঁর হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সৌন্দর্যের আয়না সদৃশ। প্রতিটি সৃষ্টির (تعين) মধ্যে যেমন প্রকৃত চিরস্থায়ী স্বত্বা, পরিপূর্ণ اَلَّذِىْ বিশ্ব প্রতিপালকের জল্ওয়া (জ্যোতি) বিদ্যমান, তেমনি প্রতি সৃষ্টের মধ্যে নূরানী হাকীকত পরিপূর্ণ আবদ, সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরও আলোকচ্ছটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

اَلَّذِىْ এবং عَبْدُهٗ উভয় পদই অস্পষ্টাতার্থক (مبـهم) অর্থের এ অস্পষ্টতা এ মর্মে ইঙ্গিতবহ যে, আল্লাহপাকের স্বত্বাগত সৌন্দর্যরূপ সমস্ত সৃষ্টি জগতের নিকট যেমন অস্পষ্টই (مـبـهـم) রয়েছে, তেমনি হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম পবিত্র স্বত্বার সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণতার প্রকৃত পরিচিতি ও বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর নিকট অস্পস্ট এবং গোপনই রয়েছে।

'আবদিয়াতের স্তর' আল্লাহর নৈকট্যের মধ্যে এমনি উন্নততর যে, সেখানে বান্দা স্বীয় অস্থিত্বকে খুঁজে পায় না; বরং 'মাবুদ' (আল্লাহ) এর জ্যোতিচ্ছটায় নিজে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। এজন্যই তো আল্লাহপাক হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে এ ধরনের স্থানে (رَسُوْلُهٗ (তাঁরই রছুল), وَنَبِيُّهٗ, (এবং তাঁরই নবী) ইত্যাদি বিশেষণ এরশাদন করেন নি বরং এরশাদ করেছেন عبده তাঁরই বান্দা।

মে'রাজ শরীফের বর্ণনা عَبْدُهٗ (তাঁরই বান্দা) এরশাদ করে আল্লাহ তায়ালা এ হাকীকতের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, 'এ অতুলনীয় নৈকট্য সত্বেও যা মে'রাজ শরীফের মহান রাত্রি আমার (আল্লাহ) হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে প্রদান করা

হয়েছে, তিনি আমার 'আবদ' বা বান্দা, 'মাবুদ' বা উপাস্য নন। অনুরূপ যিনি পবিত্র কোরআন মজীদের ন্যায় এক মহান কিতাবের ধারক, এতদসত্বেও তিনি হলেন আমার বান্দা, 'মাবুদ' কিংবা তাঁর পুত্র নন। (যেমন ইহুদী ও খৃস্টানগণ তাদের নবীগণকে খোদা বা খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করতো (নাউজুবিল্লাহ) তেমনি মোটেই নয়)।

'আবদ' (বা গোলাম) বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে 'আবদ' তিন প্রকার। যথা– ১. عبد رقيق (আব্‌দ রাকীক), ২. عبد آبق (আবদে আবেক) এবং ৩. عبد ماذون (আবদে মা'যুন)। 'আবদে রাকীক' হলো সেই ক্রীতদাস যে, পূর্ণরূপে স্বীয় মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীনে থাকে। 'আবদে আবেক্ব' হচ্ছে– স্বীয় মালিকের নিকট থেকে পলাতক গোলাম যে এ পার্থিব রূপক মালিক বা মুনিবের ও মালাকান ও কর্তৃত্বের বাইরে পলায়ন করে। আর 'আবদে মা'যূন' হলো– সেই গোলাম, যে স্বীয় মুনিবের মালিকানায় এবং তাঁর কর্তৃত্বাধীনে থাকে। তবে তার উপযুক্ততা, যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা কিংবা বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে তার মুনিব তাকে আপন কাজ-কারবারে তাকে ইখ্‌তিয়ার বা অনুমতি দিয়েছেন। তদুপরি, তাকে এ অনুমতিও দিয়েছেন যে, মুনিবের কাজ-কারবারে বৈধ ও সম্ভবমত ইখতিয়ার বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। যেমন, মুনিবের কোন বস্তুকে তার বেচা কেনা, লেন-দেন ইত্যাদি বস্তুতঃ মুনিবেরই বেচাকেনা ও লেনদেনের শামিল হবে। অনুরূপভাবে, সাধারণ মুমিনগণ, বাধ্য হোক কিংবা অবাধ্য বা গুনাহ্‌গার হোক, বস্তুতঃ সবই আল্লাহ্‌র 'আবদে রাকীক্ব' সদৃশ। আর কাফের ও মুনাফিকগণ হলো 'আব্‌দে আবেক্ব' (পলাতক গোলাম) এর ন্যায়। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার প্রিয় ও নৈকট্যার্জিত বান্দাগণ হলেন 'আবদে মাযূন বা ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা সকল। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রত্যেককে স্বীয় নৈকট্যানুসারে তাঁর প্রদত্ত ইখতিয়ার দ্বারা ধন্য করেন। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র সৃষ্টি জগতে জনাবে রছুলুল্লাহ্ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ই সর্বাধিক ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা। এজন্যই আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

অর্থাৎঃ তিঁনি (হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তো স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না, যা বলেন তা'তো অন্য কিছুই নয়, শুধু নাজিল কৃত ওহীই।'

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে–

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

অর্থাৎঃ হে হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আপনি (ধুলি) নিক্ষেপ করেননি যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন; কিন্তুআল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।'

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আনুগত্য করেছে সে আল্লাহরই আনুগত্য করেছে।

আরো এরশাদ করেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ.

অর্থাৎঃ 'হে হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিশ্চয়ই যারা আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করেছে নিঃসন্দেহে তারা আল্লাহর নিকট বায়াত গ্রহণ করেছে, তাদের হাতের উপর আল্লাহরই (কুদরতের) হাত রয়েছে। তাছাড়া, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন–

اَللّٰهُ يُعْطِيْ وَاَنَا قَاسِمٌ

অর্থাৎঃ 'আল্লাহ্ পাক দান করেন, আর আমি হলাম বন্টনকারী।

উপসংহারে বলা যায় যে, যেহেতু হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন 'আল্লাহর পক্ষ থেকে ইখতিয়ার ও অনুমতি প্রাপ্ত বান্দা, সেহেতু হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আনুগত্য বস্তুতঃ আল্লাহরই আনুগত্যের শামিল; হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কথা-বার্তা আল্লাহরই কথাবার্তা; হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বরকতময় কার্যাদি বস্তুতঃ আল্লাহরই কার্যাদি; হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর বেচা-কেনা আল্লাহর বেচা-কেনা, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর লেন-দেন আল্লাহরই লেনদেনের নামান্তর।

عَبْدُهٗ 'আবদুহু' এর اِضَافَتْ বা সম্বন্ধ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ এখানে عبد পদটাকে "ه" সর্বনামের (ضمير) সাথে اضافت বা সম্বন্ধিত করা হয়েছে, এ ه - ضمير বা সর্বনামটা 'আল্লাহ'র বিশেষ্য পদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। এ'তে আল্লাহ্পাক এ হেকমতই প্রকাশ করেছেন যে, 'আমার মাহ্বুব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অন্যান্য সব বান্দার মতই عبد বা বান্দা নন; বরং তিনি হলেন খাস 'আবদ' (عبد) ; তিনি শুধু 'আবদ'ই নন; বরং তিনি হলেন "عبده" (আবদুহু)। অর্থাৎ আবদুহু (عبده) এর মধ্যে সেই ضمير متصل (সম্বন্ধিত সর্বনাম) ব্যবহৃত হয়েছে, য'র সাথে عبد শব্দটাকে اضافت (সম্বন্ধিত) করা হয়েছে, নিয়ম মোতাবেক مضاف এবং مضاف اليه যথাক্রমে, যা সম্মানিত করা হয় ও যাঁর সাথে সম্মানিত করা হয় এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক একান্ত জরুরী। কাজেই বুঝা গেল যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম 'মকামে হুইয়ত (مقام هوية) বা (খোদার নৈকট্যের সর্বোচ্চ) স্তর বিশেষ যাতে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ব্যতীত অন্য কেউ পৌছতে পারেনি। অন্য শব্দে লাহুত জগতেরই আবদ। এখানে আবদ মানে আবেদ বা উপাসনাকারী। অন্যান্য বান্দাগণের কথা এর বিপরীত ধর্মী। যেমন কেউ হলো আলমে নাছুত বা জড় জগতের বান্দা। কেউ হলো আলমে মালাকুত বা ফেরেস্তা জগতের বান্দা। আবার কেউ হলো আলমে জাবারাত বা অসীম জগতের বান্দা। আরবী তথা সুফিতাত্ত্বিক পরিভাষায় উপরোক্ত বিভিন্ন জগতের পারিভাষিক বান্দা হিসেবে যথাক্রমে কেউ হলো; 'আবদুল্লাহ' (عَبْدُ اللّٰهِ) কেউ হলো 'আবদুন্ লিল্লাহ' (عَبْدٌ لِلّٰهِ) কেউ 'আবদুন লাহু' (عَبْدٌ لَهٗ) এবং কেউ হলেন عَبْدُهٗ (আবদুহু), এ 'আবদুহু' (عَبْدُهٗ) আর কেউ নন, একমাত্র মুহাম্মদ রছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ।(এর বিস্তারিত বর্ণনা স্থান বিশেষে দেয়া হবে)

তাছাড়া লক্ষ্যণীয় যে, কোরআন করীমের যেখানে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কথা عَبْدُهٗ (আবদুহু) দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে আল্লাহপাক عَبْدُهٗ এর পর

তাঁর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম স্বত্বাগত পবিত্র ও বরকতময় 'নাম' (মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) উল্লেখ করেননি, যেমনিভাবে হযরত জাকারিয়া (আঃ) সম্পর্কে এরশাদ করেন– عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (আবদুহু যাকারিয়া) অর্থাৎঃ 'তাঁর বান্দা যাকারিয়া (আঃ)। এ'তে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন এমন এক জগতের বান্দা যাতে সে 'বান্দার' কোন স্বাত্বাগত কিংবা গুণগত নাম থাকার প্রশ্ন থাকে না, কারণ তা আল্লাহর নৈকট্যে আবদিয়াতের এমন পরিপূর্ণ স্তর যে, এর 'মোশাহাদার' (একাগ্র দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণে) স্বীয় অস্থিত্বকে 'ফানা' বা বিলীন করতে বাধ্য হয়। এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন নবী, কোন রছুল, কোন ফেরেস্তা কিংবা কোন জিনিষের পক্ষে সে মর্যাদায় পৌছানো সম্ভবপর নয়। সেই সর্বোন্নত স্তর হলো 'মকামে হুইয়ত' বা 'আলমে লাহুত'। ('আলমে লাহুত'- খোদার নৈকট্যের এমন একটা জগত যাতে পৌছলে খোদার সাথে বান্দার এমন নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় যে, খোদার নূরে তাঁর (বান্দা) অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়)। আর সেই মহান স্তর বা উন্নত ও অসীম জগতের মহান বান্দা হলেন সেই পবিত্র স্বত্তা, যিনি হলেন هُوَ সর্বনামের বিশেষ্য পদ (অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ।

বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, আল্লাহর মখলুকাতের মধ্যে কেউ হলো 'আলমে জাবারুত' বা অসীমজগতের 'আবেদ' বা উপাসক। যেমন– আল্লাহর অতি ঘনিষ্ট নবীগণ (আঃ) এবং গভীর নৈকট্যার্জিত ফেরেস্তাগণ (আঃ)। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এঁদের সাথেও 'আবেদ' বা আল্লাহর এবাদতকারী। কেউ হলো 'আলমে মালাকুতের' 'আবেদ' বা উপাসনাকারী। যেমন– অন্যান্য নবীগণ (আঃ) এবং বাকী সব ফেরেস্তা। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁদের সাথেও এবাদতকারী। তাছাড়া, গাউছ, কুতুব প্রমুখ উচ্চ স্তরের আউলিয়া কেরামও এ 'আলমে মালাকুত' বা ফেরেস্তা জগতের 'আবেদ' হতে পারেন। কেউ কেউ হলেন 'আলমে নাছুত' বা জড় জগতের 'আবেদ' বা এবাদতকারী। যেমন অলিগণ, হক্কানী ওলামায়ে কেরাম এবং মুমিনগণ প্রমুখ। হুজুর করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাদের সাথেও এবাদতকারী। কিন্তু সর্বোচ্চ জগত 'আলমে লাহুত' এর এবাদতকারী একমাত্র হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ই।

এজন্যেই সে পবিত্র স্বত্বা পরিপূর্ণতম এবং অধিক স্তর মর্যাদাবান বান্দা এবং তিনি কখনো সেই একক লা-শরীক জ্বাতে পাক খোদা তায়ালার নৈকট্য থেকে পৃথক হন না। আর আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য সব সম্পর্ক থেকে পাক পবিত্র। সাধারণার্থে 'আবদ' নামের স্বত্ত্বার মধ্যে যেসব দোষ-ত্রুটি ও অপরিপূর্ণতা থাকে সেসব কিছু থেকেও পবিত্র। এ নিগুঢ় তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আবদুহু (عَبْدُهٗ) বা একক ও শরীক বিহীন স্বত্ত্বা খোদা তায়ালার তাজল্লী (খোদায়ী স্বত্তার নূরানী জ্যোতি) প্রতিফলনের যোগ্যতম স্থান হলেন–আবদে ওয়াহ্দাহু বা একক ও বেনজীর বান্দা–হুজুর করীম ﷺ (দঃ পৃথিবীর প্রায় সব জ্ঞানী ও শিক্ষার্থীর জানা আছে যে, এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে اَللّٰهُ (আল্লাহু) শব্দ অপেক্ষা শুধু هُ বা هُوَ আরো অধিকতর মাহাত্ম্যপূর্ণ। কারণ اَللّٰهُ (আল্লাহু) শব্দটা আলমে নাছুত জড় জগত এবং 'আলমে মালাকুত বা ফেরেস্তা জগতবাসীদের জন্য দৈনন্দিন ওজীফা। লক্ষ্য করুন– যদি اَللّٰهُ (আল্লাহু) শব্দ থেকে আলিফটা উহ্য রেখে লিখা হয় তবে হয় لِلّٰهِ (লিল্লাহ)। যেমন কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে– لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। (লিল্লাহি মা ফিচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি) অর্থাৎঃ আল্লাহরই জন্য যা কিছু আসমান সমূহে এবং জমীনে রয়েছে। আর যদি প্রথম لام (লাম) টাও উহ্য রাখা হয় তবে হয় لَهٗ (লাহু)। যেমন এরশাদ হয়েছে।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ। (লাহু মুলকুচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি। অর্থাৎঃ তাঁরই (আল্লাহ) জন্য আসমান সমূহের এবং জমীনের বাদশাহী। আর যদি দ্বিতীয় لام(লাম)টাও উহ্য রাখা হয় তবে থাকে শুধু "ه" (হু) যেমন এরশাদ হয়েছে هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ। (হুয়াচ্ছামীউন বাছীর) অর্থাৎঃ তিনি (আল্লাহ) সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (ওয়াহুয়া বিকুল্লি শাইয়িন আলীমুন) অর্থাৎঃ এবং তিনি প্রত্যেকটা বস্তু সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীরুন) অর্থাৎঃ এবং তিনি প্রত্যেকাটি বস্তুর উপর; যা তিনি চান, ক্ষমতাবান। هُوَ الْخَالِقُ الْبَارِئُ। (হুয়াল খালিকুল বারী) অর্থাৎঃ তিনিই সৃষ্টিকর্তা। هُوَ الشَّاهِدُ

(হুয়াশ্ শাহেদু) অর্থাৎঃ তিনিই সাক্ষী। هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ (হুয়াল্লাহুলল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু) অর্থাৎঃ তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই' ইত্যাদি। সুতরাং জ্বাতে ওয়াহ্‌দাহু (আল্লাহপাক) আপন বান্দা (عبد)কে সেই সর্বনাম (ضمير) এর সাথে اضافت (সম্বন্ধ) করেছেন যার উপরে অন্য কোন স্তর নেই। আর সেই স্তর হলো– 'মকামে হুইয়ত' (مقام هويت) বা আলমে লাহুত। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ই হলেন এ স্তর জগতের 'আবেদ' বা এবাদতকারী। একজন্যই হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে "عَبْدُهٗ" (আবদুহু) "ہٗ" সর্বনামের সাথে (সম্বন্ধ সহকারে) এরশাদ হয়েছে।

কাজেই, তিনি যখন 'আলমে নাছুত' বা জড় জগতের 'আবেদ' তখন তাঁকে 'আবদুল্লাহ' (عَبْدُ اللّٰهِ) (অর্থাৎঃ আলমে নাছুতবাসীদের ওজীফা 'আল্লাহ' শব্দের সাথে সম্বন্ধ সহকারে) বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন এরশাদ হয়েছে لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ (লাম্মা ক্বামা আবদুল্লাহি ইয়াদ্‌য়ু) অর্থাৎঃ যখন আল্লাহর খাস বান্দা প্রার্থনা রত অবস্থায় দণ্ডায়মান হন। এখন লক্ষ্য করুন! হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আবদিয়াত রূপী বৈশিষ্ট্য বা গুণের সমতুল্য অন্য কোন অধিক পরিপূর্ণ ও মর্যাদাবান গুণ নেই। কেননা, এটা হলো عَبْدُهٗ এর মকাম বা পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য।

এ জন্যই হযরত কেবলা আল্লামা ছৈয়দ আহমদ সাঈদ কাজেমী শাহ ছাহেব (রহঃ) বর্ণনা করেছেন– মেরাজ শরীফে যিনি اَلَّذِىْ অর্থাৎঃ আল্লাহ তায়ালা তিনি عَبْدُهٗ বা তাঁর বান্দা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর سَمِيْعٌ وَبَصِيْرٌ শ্রোতা ও দ্রষ্টা। পক্ষান্তরে, যিনি عَبْدُهٗ (তাঁর খাস বান্দা) তিনিই اَلَّذِىْ এর শ্রোতা ও দ্রষ্টা ছিলেন।

এখন লক্ষ্যণীয় যে, عبد (আবদ) শব্দের অর্থ, সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণে আরবী অভিধান ও বহুল প্রচলিত কিতাবাদির বর্ণনানুযায়ী, সন্দেহাতীতভাবে, শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এ শব্দটির বোধগম্য অর্থ (مفهوم) এবং 'অনুমোদন (مصداق) এর প্রেক্ষিতে ও তা পূর্ণতা জ্ঞাপক। কিন্তু যেহেতু এ পূর্ণতা (كمال) পর্যন্ত প্রকৃত অনুসন্ধানকারী

ব্যতীত কোন গন্যমান্য কিংবা নগন্য ব্যক্তিবর্গের কেউ পৌছতে পারে না, সেহেতু 'আবদ' শব্দের ব্যবহারের বেলায় খাস বরং সর্বাধিক খাস বান্দাগণের হুকুম সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন ধরনের নিয়ম পালনীয়। অর্থাৎঃ খাস ব্যক্তিবর্গের জন্য বৈধ কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য সম্মান সূচক বিশেষণ পদ্ধতি করা ছাড়া জায়েয নেই। কেননা কোন কোন 'আবদ' এর অর্থ হয় দাস। তাছাড়া কেউ কেউ 'আবদ' (عبد) শব্দের এমন এমন অর্থও বলে থাকে যে 'অর্থের' মধ্যে পূর্ণতা কিংবা মর্যাদা জ্ঞাপক কোন প্রকার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ তো নেই, বরং ত'াতে ঘৃণা ও অবমাননার অভাব পাওয়া যায়। অথচ 'আবদুহু'কেই (عَبْدُهٗ) আল্লাহর নূরের তাজাল্লীর পূর্ণ প্রতিফলনের আয়না স্বরূপ করা হয়েছে। এ নিগুঢ় রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করেই পবিত্র হাদীস শরীফে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন–

مَنْ رَآنِىْ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

অর্থাৎঃ 'যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে সেই আল্লাহকেই দেখেছে।' কাজেই, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন খোদাদর্শনের আয়না সাদৃশ এবং পূর্ণরূপে খোদা দর্শনের একটা মাধ্যমই।

কাজেই, বুঝা গেল যে, সম্মান সূচক শব্দের সংযোজন ব্যতিরেকে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে শুধু 'আবদ' শব্দের উল্লেখ করা জায়েয নাই। সুতরাং 'তাশাহুদ' ইদ্যাদিতে 'আবদুহু' এর পরপরই 'ওয়ারাছুলুহু' এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জন্য শুধু 'আবদ' শব্দের ব্যবহার সম্মান সুচক শব্দের সংযোজন ব্যতিরেকে সমীচীন নয়। যদি কেউ পরমাণু পরিমাণ অসম্মান প্রদর্শন পূর্বক এ শব্দটা (عبد) হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে ব্যবহার করে তবে তার ভ্রান্তি 'কুফর' পর্যন্ত পৌছা নিশ্চিত। কারণ 'নবীর' অবমাননা সর্বসম্মত কুফরী।

এ মছআলাটা 'বশর' (بشر) শব্দের মতই। অর্থাৎ হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জন্য শুধু "بشر" (মানুষ) শব্দের ব্যবহার করা জায়েয নেই। যেমন– ফতোয়া-এ-মাহ্ রিয়াহ্ শরীফে উল্লেখ করা হয় অতীব সম্মান ও ভক্তি সহকারেই হুজুর

(ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে সম্মান করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ওয়াজিব কিংবা ফরজ বা একান্ত অপরিহার্য।

بشـــر (বশর) শব্দের অর্থে আরবী আভিধানিক অর্থসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে মহত্ব ও পূর্ণতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু এ 'পূর্ণতা' পর্যন্ত নিগুঢ় তত্ত্ববিদ ও সুদক্ষ জ্ঞানী ব্যতীত কেউ পৌছতে পারে না, সেহেতু بشـــر (বশর) শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের জন্য বিশেষ বুজুর্গ ব্যক্তিবর্গ বরং বিশেষতম ব্যক্তি বা স্বত্বার হুকুম সাধারণ মানুষ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য জায়েয হতে পারে আর সাধারণ মানুষের জন্য সম্মান সুচক বিশেষণ পরিবর্ধন ব্যতিরেকে জায়েয হবে না।

যেমন; হযরত 'আদম (আঃ)কে এ কারণে 'বশর' (بشـــر) বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরতের হস্তদ্বয়ের সাথে তাঁর সত্বার স্পর্শরূপী মহান মর্যাদা লাভ হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক স্বীয় কুদরতের হাতে ছৈয়্যদুনা আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইবলীসকে আল্লাহ তিরস্কার সূত্রে এরশাদ করেছেন।

مَامَنَعَكَ اَنْ لَّاتَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِىَّ

অর্থাৎঃ 'সে কি জিনিষ ছিল যা তোমাকে সে সৃষ্টিকে সাজদা করতে বারণ করেছে যাকে আমি স্বীয় কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছি।' ফেরেস্তাগণ যেমন আদম (আঃ) এর সে মহত্ব ও পূর্ণতা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন তেমনি ইবলীসও (অজ্ঞাত ছিল)। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, ফেরেস্তাগণ সে সম্পর্কে বলে দেয়ার পর তা অনুধাবন করেছেন এবং নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করেছেন। তাঁরা আরজ করলেন–

فَقَالُوْا سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا

অর্থাৎঃ (হে আমাদের প্রতিপালক!) আপনারই পবিত্রতা, আমাদের তা ব্যতীত কোন জ্ঞান নেই যা আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আর ইব্লীসের মনে আদম (আঃ) এর মহত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা ছাড়া ও অহংকার বিদ্যমান ছিল। এজন্যই এরশাদ হয়েছে– اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ الاٰية অর্থাৎঃ সে (ইবলীস)

অস্বীকার করেছে এবং অহংকার করেছে।

বস্তুতঃ মানুষ (بشـــــر) কেই পূর্ণ মহত্বের প্রকাশস্থল করা হয়েছে। আর ফেরেশ্তাগণ তাদের অপূর্ণতার কারণেই সে পূর্ণতার প্রকাশস্থল হবার সৌভাগ্য থেকে মাহরূম রয়েছে।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, সমস্ত নবী (আঃ)ই হলেন পূর্ণতার প্রকাশস্থল সমূহ, কিন্তু সে পূর্ণতার প্রকৃত প্রকাশস্থল সমস্ত নবী (আঃ) এর মধ্যে ছৈয়্যদুনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম। আর হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর উত্তরাধিকারী হিসেবে সে পবিত্র নামের পূর্ণতম প্রকাশস্থল হলেন ছৈয়্যদুনা হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রাঃ)।

পক্ষান্তরে 'বশর' নামের অধিকারী কিছু লোকের প্রাপ্য হলো অবনতির সর্বনিম্ন স্তর। তাই এ শব্দটার (বশর) ব্যবহারে এতই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে যে, এ'তে সামগ্রিক দ্বিক নাম সমূহের বিন্যাস এবং উপাদানগত দিক দিয়ে শরীর সমূহে গঠন প্রণালীর প্রেক্ষিতে হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে হুজুর করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র শরীর মোবারকের প্রকাশ পর্যন্ত সবগুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখা হয়েছে। কাজেই 'বশর' (بشر) শব্দের ব্যবহার সম্মান সুচক বিশেষণের সংযোজন ব্যতিরেকে জায়েয হবে না। এজন্যই قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আল-আয়াতে "بشـــر" (বশর) শব্দের পর يُوْحٰى اِلَىَّ এরশাদ হয়েছে অর্থাৎ হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এমন এক মহা মর্যাদাবান 'বশর' (মানব) যাঁর প্রতি ওহী এসেছে। অনুরূপ, বুজর্গানে দ্বীন ও আরেফগণের মন্তব্য হলো

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيْهِ اَنَّهٗ بَشَرٌ وَاَنَّهٗ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

অর্থাৎঃ মোটকথা– হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–"بشر" (মানব) এবং তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

সুতরাং প্রমানিত হলো যে, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে সম্মান সূচক নামে স্মরণ করা ওয়াজিব বা একান্ত অপরিহার্য। গোমরাহ্ ফের্কা ওহাবী সম্প্রদায়ের ন্যায় হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শানে শুধু "بشر" বা মানুষ শব্দের ব্যবহার মোটেই জায়েয

নেই, এরূপ করা কখনো উচিৎ হবে না।

তাছাড়া কোরআন করীমের কোথাও হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে 'বশর' বা 'মানুষ' বলে সম্বোধন করা হয়নি। তবে এতটুকু এরশাদ হয়েছে– اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (আমি হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তোমাদের মত মানুষ) বটে, বস্তুতঃ এ ঘোষণার উদ্দেশ্য হলো– খৃস্টান সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আঃ) এর বিভিন্ন মো'জেযা দেখে তাকে 'খোদার পুত্র' বলে আখ্যায়িত করে বসে; ইহুদীগণ হযরত ওযায়ের (আঃ)-এর মাত্র দু'একটা মো'জেযা প্রকাশ পেতে দেখে তাকে খোদার পুত্র বলেছিল, মুশরিক বা অংশীবাদীগণ ফেরেস্তাদেরকে খোদার কন্যা সমূহ বলে বিশ্বাস করতে থাকে। (নাউজুবিল্লাহ) আবার অনেকে জ্বীন জাতির সাথে খোদা তায়ালার আত্মীয়তার সম্পর্ক মেনে নেয়। এমতাবস্থায় হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অসংখ্য মো'জেযা দেখে যেন কেউ তাঁকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে না বসে সেজন্য আল্লাহ পাক আয়াত শরীফখানা قول দ্বারা আরম্ভ করেন। অর্থাৎ এতে এরশাদ করা হয়– 'হে মাহ্বুব আপনি বিনয় সহকারে ঘোষণা করুন; আমি তোমাদের মতই মানুষ। (খোদা কিংবা খোদার পুত্র নই)' [শানে হাবীবুর রহমান-১৩২ পৃঃ]

কিন্তু কেউ যদি তুচ্ছার্থে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে "بشر" বা মানুষ বলে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কাজেই, সম্মান সূচক বিশেষণের সংযোজন ছাড়া শুধু মানুষ বলে তাঁকে সম্বোধন করা হারাম, বরং কুফরীর কারণ হবে।

মুহাদ্দিস হযরত পীর জামায়াতআলী শাহ (রঃ) বলেছেন, মুছতাফাবিয়াতের (مصطفویت) (মুস্তাফার) মান বাশারিয়াতের (সাধারণ মানব) بشریت এর মান অপেক্ষা ২৭ ধাপ উর্ধ্বে। মুস্তফা উচ্চমান হাবীব, খলীল, রাছূল, নবী, ছিদ্দিক, মুহাজের, আনছার, ছাহাবী, তাবেয়ী, গাউছুল আযম, কুতুবুল আকতাব, কুতুব, আবদাল, আওতাদ, মুজতাহিদ, মুত্তাকী, শহীদ, ছালেহ, মু'মিন, বাশার, নিম্নমান মুস্তফার মানের উর্ধেই আল্লাহ তায়ালার মান।

মকামে মুস্তফা লাভ করার ফলে দাসত্ব বা আবদিয়াত (عبدیت) এর যত স্তর বা ধাপ আছে অর্থাৎ উল্লেখিত ২৭ মকাম বা স্তর তা সব খতম হইয়া

যায়, ইহার পর আর কোন স্তর বা মকাম থাকে না। যার পর একমাত্র উপাস্য, প্রভুত্ব বা আল্লাহ তায়ালার (الوهيت)স্তর বা মান। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) ফরমাইয়াছেন, সাধারণ মুমিনের (غايت مقام) শেষ স্তর হইতে আউলিয়া কেরামের (مقام) স্তর আরম্ভ এবং আউলিয়া কেরামের শেষ স্তর হইতে ছিদ্দিকগণের স্তর আরম্ভ এবং তাঁহাদের শেষ স্তর হইতে নবীগণের মকাম আরম্ভ, এবং নবীগণের (غايت مقام) শেষ ধাপ হইতে রাছুলগণের মকাম বা স্তর আরম্ভ এবং রাছুলগণের শেষ স্তর (اولوالعزم) মহা সম্মানিত রাছুলগণ যাঁহাদের নিকট বড় বড় কিতাব নাজিল করা হইয়াছে তাঁহাদের মকাম আরম্ভ এবং ছাহেবে কিতাব রাছূলগণের শেষ মকাম বা স্তর হইতে জনাবে মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মকাম বা ধাপ আরম্ভ এবং মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর মকাম বা ধাপ এর শেষ কোথায় তাহা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানে না। অর্থাৎ মকামে মোস্তফার শেষ কোথায় তাহা জানা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়, যেই আল্লাহ পাক ইহা দান করেছেন তিনি একমাত্র মোস্তফার শেষ 'মাকাম' কোথায় তা জানেন।

অতএব যেই রাছুল মকামে মোস্তফায় কৃতকার্য বা সফলকাম হয়েছেন তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা বা ধারণা করা কত যে বোকামী তাহা নিজেই চিন্তা করে দেখুন। (তযকেরায়ে নকশবন্দীয়া)

মুস্তফার স্তরে উঠলে আবদ (عبد) বা গোলাম হওয়ার অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়।

নকশা অনুযায়ী সর্ব নিম্ন মানের লোক যদি বলে যে আমি সর্বোচ্চ মানের লোকের সমান, তাহলে সেটা কতই না অমুলক ও ভ্রান্ত কথা। আমরা মানব, বশর (بشر) আমাদের ছায়া আলোকিত জায়গাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও মানব কিন্তু তিনি জ্যোতির্ময় (نورانى)। অন্ধকার জায়গাকেও আলোকিত করে তোলে। তাঁর এ নূর খোদা প্রকৃতিকের নূর। মক্কা, মদীনা, আরব, আযম বা আরশ পরশের নয় বরং তা কুদছী জগতের নূর। হ্যাঁ তাঁর মানব জাতিত্ব (بشريت) থাকার দরুন মক্কা, মদীনা, হাশেম, মতলাব ও হেযাজের সাথে তাঁর সম্পর্ক। মোট কথা আমাদের রাছুলের মানব জাতিত্ব (بشريت) ঐ স্থানে উন্নীত যেখানে রাছুল

হওয়ার মান অবস্থিত। মানব জাতিত্বের পরিসরে এসে রাছুল হন। (قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) পেয়ারে মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজেই নিজেকে (بشر) বা মানুষ বলিয়া ঘোষণা করাটাই হুজুরের একমাত্র (كمالیت) বা পরিপূর্ণতার পরিচয়। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া যদি আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে অন্যান্য মানুষ বা (بشر) এর মত হওয়ার দাবী করে তবে সে কাফের হইয়া যাইবে। নবীগণ নিজেই নিজের জন্য (ظالم) জালেম, গোমরাহ এইসব ধরনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাই বলি আমরাও নবীগণের জন্য সেই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা এটা কোন দিন শরীয়তের অনুমোদিত হইতে পারে না। অর্থাৎঃ ঐ সব ধরনের শব্দ নবীগণের জন্য ব্যবহার করা দুরস্ত নয় বরং হারাম।

অতএব বুঝা গেল যে, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজেই নিজেকে (بشر) বা মানুষ বলিয়াছেন। তাই আমরাও রাছুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে আমাদের মত মানুষ বা (بشر) বলা এটা কোন দিন বৈধ হইতে পারে না। মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেছেন–

کافراں دیدند احمدرا بشر+ چو ندیدند ازوی آں شق القمر

همسری با انبیاء برداشتن + اولیارا همچوں پنداشتن.

কাফের হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে মানুষ হিসেবেই দেখেছে।এ কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না যে তাঁর আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দুই টুকরো হয়েছে। নিজেদেরকে নবীগণের সমকক্ষ এবং ওলিগণকে নিজেদের মতই সাধারণ মানুষ মনে করেছে। এই হলো শয়তানের দলকে চিনিবার উপায়।

আমরা একথাই বলতে চাই যে, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আবদ এবং বাশার। আল্লাহর বান্দা বা মানুষ। কিন্তু তোমাদের মত নয়। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কখন থেকে আব্‌দ কারো জানা নাই। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَنِیْ عَبْدًا قَبْلَ اَنْ يَّتَّخِذَنِیْ نَبِیًّا

আল্লাহপাক আমাকে নবী বানানোর আগেই বান্দা (عبد) বানিয়েছেন। দেখুন! হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে প্রথমে আব্‌দ তারপর নবী তারপর বাশর বানানো হয়েছে এবং তারপর রাছুল বানানো হয়েছে। আদম (আঃ) এর আগে

আমার রাছুলকে নবী বানানো হয়েছে এবং হযরত ঈসা (আঃ) এর পরে রাছুল বানানো হয়েছে। সে কথার দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহপাক হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে (عبد) আব্‌দ ইত্যাদি দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন।

অতএব হুজুরের আব্‌দ হওয়া ও আমাদের আব্‌দ হওয়ার মাঝে আসমান জমীন ব্যবধান। বরং তার সাথে কোন তুলনা চলে না। কেননা বাশার হওয়া আমাদের জন্য হাকীকত বা আসল প্রকৃতি। আর হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জন্য বাশার হওয়া পোষাক মাত্র। পোষাক খুললে হাকীকত বদলে যায় না। আমাদের বাশার বা (بشريت) (মানব) হওয়া শেষ হয়ে গেলে সব গুণাবলি (سب اوصاف) শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নবীজীর (بشريت) বাশার হওয়া বাদ দিলেও তিনি নবী থাকেন।

যেমন উপরে বর্ণিত হলো।

আমি তোমাদের মত মানুষ, আয়াতে মানব জাতিত্বর (لباس بشرى) পোষাকের কথা।

আর (اَيُّكُمْ مِثْلِىْ لَسْتُ كَاَحَدِكُمْ) তোমাদের মাঝে কে এমন আছে যে আমার মত হবে? আমি তোমাদের কোন একজনের মত নই। ইহা মালাকুতি লেবাছের কথা। (لِىْ مَعَ اللّٰهِ وَقْتٌ) আল্লাহর সাথে আমার জন্য এমনও সময় আছে যেখানে নিকটতম ফেরেস্তাও প্রেরিত নবীগণ পর্যন্ত পৌছা অপারগ এবং অক্ষম হয়ে পড়েন। ইহা তাঁর আসল প্রকৃতির কথা। শেষ হাদীছে মানব জাতিত্বের পোষাকের কথা নয় বরং হুজুর (সঃ) এর আসল রূপের কথা। বিখ্যাত মে'রাজের ঘটনা তার প্রকৃত প্রমাণ, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হুজুরের সাথে মক্কা শরীফ থেকে চললেন, মানব জগত (عالم بشريت) অতিক্রম করলেন, ফেরেস্তা জগত (عالم ملكوت) অতিক্রম করলেন, পদার্থ জগত (عالم عناصر) অতিক্রম করলেন, রূহ জগত (عالم ارواح) অতিক্রম করলেন। এসব অতিক্রম করে হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এমন মঞ্জিলে পৌছলেন যেখানে জিব্রাইল (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন হে জিব্রাইল এখানে

কেন থেমে গেলেন? মক্কা থেকেই আমার সাথেই ছেদরায় এসে কেন পৃথক হয়ে যাচ্ছেন? এগিয়ে চলুন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরয করলেন যা শেখ ছাদী কলমের মুখে এরূপ বলেছেন।

اگر یکسر موئے برتر پرم + فروغ تجلی بسوزد پرم

ইয়া রাছুলাল্লাহ! যদি এক চুল বরাবরও এগিয়ে যাই তবে ঔজ্জ্বল্যের তেজস্ক্রিয়া আমাকে জ্বালিয়ে দেবে। শ্লোকটির অর্থ দু'রকম হতে পারে।

১। এয়া রাছুলাল্লাহ (সঃ)! আমি যদি এক চুল পরিমাণও উপরে যাই তবে আল্লাহ তায়ালার ঔজ্জ্বল্য (تجلی) আমার পাখাগুলো জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলবে।

২। মারেফাতের আলেমগণ বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম ছাইয়েদ মোহাম্মদ মদনী ও অন্যান্যগণ বলেছেন, জিব্রাঈল (আঃ) এর উত্তরের মর্ম এই ছিল যে, ইয়া রাছুলাল্লাহ! আপনি যখন মানব জগতে ছিলেন আমি সাথে ছিলাম, যখন ফেরেস্তা জগতে ছিলেন আমি সাথে ছিলাম কিন্তু এখন আপনি আপনার প্রকৃত জগতে ঢুকে পরবেন তখন আপনার ঔজ্জ্বল্য (تجلی) বরদাশত করার শক্তি আমি নূরের তৈরী ফেরেস্তার কাছেও নেই।

এখানে চিন্তা করলে আরো একটি রহস্য পাওয়া যায়। উহা এই যে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) হুজুরকে নিজের মত মনে করেননি এবং নিজেকেও হুজুরের মত মনে করেননি। যদি এরূপ মনে করতেন তাহলে জিব্রাইল (আঃ) রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে রুখে বলতেন যে, আগে যাবেন না থেমে যান! আমি ছেদরার লোক যখন জ্বলে যাব আপনি মক্কার লোক কি করে বাঁচতে পারেন। যখন মাছুম ফেরেস্তা জ্বলে যায় তখন জমীনের লোক কিভাবে বাঁচবে? যখন নূরের তৈরী ফেরেস্তা জ্বলে যায় তখন পানি, মাটি, আগুন, বাতাস (عناصر اربع) এর তৈরী মানুষ (بشر) কি করে বাঁচতে পারে? জায়গাটি বড়ই বিপদজনক! বরং দেখা গেল, হযরত জিব্রাইল (আঃ) মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে যেতে দিলেন এবং নিজে থেমে গেলেন। যদি জিব্রাইল নিজেকে রছুলের মত মনে করতেন তবে জিব্রাইল নিজেও এগিয়ে যেতেন। মুসলমানগণ! এবার ভেবে দেখুন, ফেরেস্তাগণের সর্দার হযরত জিব্রাইল (আঃ) যিনি

নূরের তৈরী, যিনি পবিত্র কোরআন, জবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল বহন করে রাছুলগণের কাছে এসেছেন, যিনি ছেদরাতুল মুন্তাহায় থাকেন তিনিও আল্লাহ তায়ালার মাহ্বুব মোস্তফা (দঃ)কে নিজের মত মনে করেননি। এমতাবস্থায় দু'পা বিশিষ্ট জানোয়ার যদি আল্লাহর মাহবুবকে নিজের মত মনে করে বসে তবে তা মস্তিষ্ক বিকৃতি ছাড়া আর কি? অতএব বুঝা গেল (قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) আয়াতটি পেশ করে হুজুর (দঃ) কে নিজের মত মানুষ মনে করা নিতান্ত ভুল। আল্লাহপাক বলেছেন, 'বলে দাও' (قُلْ) কাকে বলবে? ছিদ্দিক, ওমর, ওছমান, আলী (রাঃ)কে অন্যান্য ছাহাবাকে? মোহাজের আনছার বা আহ্লে বায়াতকে বা অন্য কোন মুসলমানকে? নয় কখনও নয়। বরং তাদেরকে যারা এখনও ইসলামের ছত্রছায়ায় আসেনি আবু জেহেল ও অন্যান্য কাফেরদেরকে বলে দাও যে, আমি তোমাদের মতই মানুষ। যদি এ' অর্থ না দেয়া হয় তাহলে আয়াতটি আয়াতে মোতাশাবাহাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন শাহ আবদুল হক মুহাদ্দেছে দেহ্লভী 'মাদারেজুন্ নবুয়্যত' নামক কিতাবে লিখেছেন।

এখন বিরুদ্ধ বাদীদের কাছে আমাদের আরয মাত্র একটি দৃষ্টান্তই এমন পেশ কর যে, কোন নবী নিজের অনুসারীকে বলেছেন আমি তোমার মত মানুষ আর অনুসারী নবীকে বলেছে আপনি আমার মত মানুষ। কোরআন থেকে আনলেও মানবো, হাদীস এমনকি জয়ীফ হাদীস আনলেও মানবো, তাওরাত, ইঞ্জিল বা অন্য কোন আসমানী ক্ষুদ্র কিতাব (صحيفه) থেকে আনলেও মানবো। কিন্তু কোথাও নেই। হ্যাঁ এমন পাওয়া যাবে যে নবী কাফেরকে বলেছেন আর কাফের নবীকে বলেছে। তাতে ভিন্ন রহস্য আছে। আবার বলুন ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীনগণের কারো নজরে (قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) এ আয়াতটি পড়েনি? তাদের কেউত নবীজীকে নিজের মত বলেনি। বরং ছাহাবায়ে কেরামগণকে হুজুর (দঃ) বলেছেন (اَيُّكُمْ مِثْلِىْ) আমার মত তোমাদের কে আছে। বিশেষতঃ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলেছেন (يَااَبَابَكْرٍ لَمْ يَعْرِفْنِىْ حَقِيْقَةً غَيْرُ رَبِّىْ) হে আবু বকর, তোমরা আমার দেয়া এলেম বুঝেছ সত্য কিন্তু আমার হাকীকত বুঝতে পারনি। এমনকি ফেরেস্তাগণের সর্দার জিব্রাইল, মিকাইল, এমন কি নবীগণের মধ্যে হতে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, মুছা কলিমুল্লাহ, হযরত আদম,

নূহ, ঈসা (আঃ) কেউই আমার হাকীকত বুঝতে পারেননি। বুঝেছেন একমাত্র আমার রব বা প্রতিপালক ও আমার খালেক বা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপাক। মানব পিতা হযরত আদম (আঃ) এর বাশারী জামা (جامہ بشریت) যখন তৈয়ার হয়নি এবং মানব জাতিত্বের সৃষ্টি হয়নি তখনই আমি নবী ছিলাম। যেমন হাদীছে আছে (كُنْتُ نَبِيًّا وَّآدَمُ بَيْنَ الرُّوْحِ وَالْجَسَدِ) যখন আদম (আঃ) রূহ এবং শরীরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিলেন অর্থাৎ তাঁকে শরীর দেয়া হয়নি তখনও আমি নবী ছিলাম। বুঝা গেল, নবী হওয়ার জন্য মানবের (بشر) আকারে হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু আমাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে নবীকে বাশারী পোষাক পরে আসা দরকারী। নবী হওয়ার জন্য মানব হওয়ার দারকার থাকলে মানবপিতা সৃষ্টির আগেই মুহাম্মদুর রছুলুল্লাহ কি করে নবী হয়ে গেলেন? যদি কেউ বলে যে, হুজুরের তখন নবী হওয়ার অর্থ এই যে, হুজুরের নবী হওয়া (نبوت) তখন আল্লাহ তায়ালার এলেমে ছিল যেমন কোন কোন লোক বলেছেন। এরূপ ব্যাখ্যা করা একেবারেই গলত। কেননা তাহলে অনিবার্য মানতে হবে যে, হুজুরের নবী হওয়া তখন আল্লাহর এলেমে ছিল কিন্তু অন্যান্য নবীগণের নবী হওয়ার এলেম আল্লাহর ছিল না। (نَعُوْذُبِاللّٰهِ)। বন্ধুগণ! উপরোক্ত ব্যাখ্যা করলে হাদীছটি প্রশংসাস্থলে বলা হয়েছিল তখন আর সেস্থলে থাকবে না। অনর্থক হয়ে যাবে। চিন্তা ভাবনা করে ব্যাখ্যা করুন নইলে আঘাত প্রাপ্ত হবেন। (قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) আয়াতে আবু জাহেল ও আবু লাহাবকে সম্বোধন করার জন্য বলা হয়েছে, তাই তারাই বলতে পারে নবী আমাদের মত লোক। কোন মোমেনের পক্ষে এরূপ বলার অধিকার নেই।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা কেউ এটা মনে করবেন না যে আমরা নবীজীকে মানুষ মনে করি না। কেননা আমাদের আকীদা এই যে, আমাদের হেদায়তের উদ্দেশ্যে নবীকে মানুষ (بشر) নামী পোষাক পরে আসা একান্ত প্রয়োজন। **আমাদের বিরোধীতা তখন, যখন কেউ বলবে যে নবী আমাদের মতই লোক তার উর্ধে নয়।** এরূপ বললে মনে চায় একখানা আয়না দিয়ে বলব যে আয়নাতে নিজেকেও দেখ এবং নবীজীকেও দেখ।

মুসলমান! নবীকে মানুষ (بشر) মেনে নেয়া এককথা আর মানুষজানা আরেক কথা। যাকিছু মেনে নেয়া হয় সবকিছু বলা যায় না। যেমন আল্লাহ

পাক সারা বিশ্বের (كائنات) মালিক। এর মাঝে পায়খানাও আছে তাই বলে কি কোন মুসলমান বলবে যে, আল্লাহপাক আমাদের পায়খানার মালিক, কখনও না। কেননা নিকৃষ্ট বস্তুর দিকে সম্পর্ক দেখানোর ফলে উক্ত কথাটি কুফরীর কথা বনে যায়। মালিক হিসাবে গুণ প্রকাশ করতে হলে এরূপ বলা উচিত, জিব্রাইলের মালিক, মুহাম্মদে আরবীর মালিক, বিচারের দিনের মালিক। যদি কেউ বলে, খোদা শুকরের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তা'হলে কাফের হয়ে যাবে কথাতো সত্য কিন্তু বলা যায় না। কেননা, নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক প্রদর্শন করলে কাফের হয়ে যায়। যদিও কথা সত্য। যদি সৃষ্টিকর্তা বলতে হয় তাহলে আহমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা বল, সমস্তের সৃষ্টিকর্তা বল। সকল মানুষই অপবিত্র পানি বীর্য থেকে তৈরী। কোন মুফ্তী, মুহাদ্দেছ অথবা পার্থিব কোন নেতাকে ডাকতে হলে যদি কেউ বলে হে নাপাক বীর্যের তৈরী। তাহলে অবস্থাটা কেমন হবে? যদিও সম্বোধনের কথাটি যথার্থ এবং কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু কেউ এমন সম্বোধন করে না, করতে পারে না। তেমনি কোন ব্যক্তি নিজের খালাকে যদি এই বলিয়া ডাকে যে, হে আমার আব্বার শালী তাহলে সে বেআদব প্রমাণিত হবে। অতএব বুঝা গেল যত কিছু মেনে নেয়া যায় সবকিছু বলা যায় না। তাই নবীকে মানব মানব (بشر بشر) বলার কি ফজীলত আছে? এরকমতো কাফেররাও বলে থাকে। হ্যাঁ যদি বলতেই চাও তবে উত্তম মানব (خير البشر) বল। যদি ইন্‌ছান বলতে চাও ফখরে ইন্‌ছান অর্থাৎ কৃতি মানুষ বা মানব গৌরব বল। যদি আদমী বলতে চাও তাহলে রূহে আদমীয়াত অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব প্রাণ বল। শুধু মানব মানব (بشر بشر) চিৎকার দেয়া মুমিনের কাজ নয় বরং কাফেরের কাজ।

এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন যোগ্য। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে আবদুল মুত্তালেবের খান্দান, আবদুল্লাহর পৃষ্ঠদেশ ও আমেনার গর্ভের মাধ্যমে এ' দুনিয়ায় নিয়ে আসার পিছনে বিরাট হেকমত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁহার মহান যোগ্যতা ও মর্যাদার জোর দেখে কেউ যেন গোমরাহ হতে না

পারে, কেউ যেন তাঁকে খোদা বা খোদার বেটা বলতে না পারে। দ্বিতীয় হেকমত এই যে, এত বড় যোগ্যতার ও মর্যাদার অধিকারী হয়েও যখন মুহাম্মদে আরবী খোদা বা খোদার বেটা হতে পারলেন না তাহলে হযরত ঈসা (আঃ) কি করে খোদা বা খোদার বেটা হয়ে যাবেন?

মুসলমানগণ! নবীকে মানুষ বলে আখ্যায়িত করার কাজ আজকে নতুন নয়, বরং অনেক আগের। আল্লাহপাক যখন শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন আদম (আঃ)কে ছেজদা করলে না? ইবলিছ উত্তর দিল (لم اكن لاسجد لبشر) মানুষকে ছেজদা করা আমার জন্য শোভনীয় নয়। শয়তান নিজেই নবীকে মানুষ বা মানব (بشر) বলে আখ্যায়িত করা শুরু করল। তাই দেখে সকল যুগের কাফেররা নবীগণকে মানব মানবই বলেছে আজও বলা হচ্ছে– কোন শায়ের বলেছেন–

بشر کہنے کی مثل اپنے انوکھی کب یہ بدعت ھے

پر انی مولوی ابلیس کے چیلوں کی عادت ھے

নবীকে মানব বলা এ'তো কোন নতুন কথা নয়, অনেক পুরান। এটা ইবলিছ মৌলভীর অনুসারীদের অভ্যাস।

দেখুন! হযরত নূহ (আঃ) এর কাওমের বড় বড় কাফেরেরা অধিনস্থদের বলে বেড়াত (مَاهٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) এই লোক তোমাদের মতই মানুষ। ছালেহ (আঃ)কে তাঁর কাওমের লোকেরা বলেছে (مَآاَنْتَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُنَا) তুমিতো আমাদের মতই মানুষ। শোয়াইব (আঃ) এর লোকেরা তদ্রুপ বলেছে। মুছা ও হারুন (আঃ) এর লোকেরা বলেছে (اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا) আমরা কি আমাদের মত দু'জন মানুষের উপর ঈমান আনবো? ইলিয়া বা ইন্তাকিয়া বাসী (اصحاب القرية) দের প্রতি তিনজন নবী পাঠানো হয়েছে। তারা বলে উঠলো (مَآاَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا) তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। যুগ যুগ ধরে নূহ (আঃ) এর লোকেরা বলেছে (مَانَرٰكَ اِلَّا بَشَرًا

(مِثْلُنَا) তোমাকেত আমাদের মত মানুষই দেখতে পাচ্ছি। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সম্পর্কেও কাফেরেরা বলেছে (هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) এতো তোমাদের মত একজন মানুষ।

আমার বক্তব্য ছিল– শুধু (عبد) আবদ এবং (عَبْدُهٗ) আবদুহু পরস্পর ভিন্ন। আবদ হলেন যিনি (আল্লাহর) আপন প্রতিপালকের প্রতি অপেক্ষামান। যেমন হযরত মুসা (আঃ) সীনাই মালভূমিতে খোদার দিদারের জন্য অপেক্ষারত ছিলেন। আর (عَبْدُهٗ) (আবদুহু) হলেন সেই মহান সত্ত্বা যাঁর জন্য তাঁর প্রভু দিদার দানের জন্য অপেক্ষা করেন। আব্দ হলেন যাঁর সম্মান তাঁর প্রভুর সাথে সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। আর (আবদুহু) হলেন সেই মহা মর্যাদাবান বান্দা যাঁর আবদিয়াতের মাধ্যমে প্রভুর মহত্ব প্রকাশ পায়। ডঃ ইকবাল এ প্রসঙ্গে কত সুন্দর বলেছেন! যার সার সংক্ষেপ হলো– 'আবদুহু' যিনি, তিনি সমস্ত বান্দার মূল বা আসল। আবদুহু তিনি, যাঁর সৌন্দর্য্যের বর্ণ সমস্ত বান্দার মধ্যে শোভা পায়, অথচ তাঁর নিজস্ব রং প্রত্যক্ষ করা যায় না। 'আবদুহু' সমস্ত বান্দার রহস্য সম্পর্কে অবহিত। সুতরাং 'আবদুহু' এর মর্যাদা পর্যন্ত অদ্যাবধি কেউ পৌছতে পারেননি। 'আবদুহু এরসাথে সমস্ত বান্দার ভাগ্য সম্পর্কিত। এ কয়টি পংক্তিতে 'আবদুহু এর অর্থ আমি পুরাপুরিভাবে বর্ণনা করতে পারিনি। যদি তুমি এর পূর্ণাঙ্গ মর্মার্থ অনুধাবন করতে চাও তবে নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ খানা পর্যালোচনা কর–

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

অর্থাৎঃ 'এবং (হে হাবীব) আপনি (ধুলিকণা) নিক্ষেপ করেননি যখন আপনি নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ পাকই নিক্ষেপ করেছিলেন।" (শানে হাবীবুর রহমান)

আল্লাহ তায়ালা نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ (তিনি আপন খাস বান্দার উপর ফোরকান (কোরআন) নাজিল করেছেন) এরশাদ করেছেন। কেননা উম্মুল

কুতুব যা আসমানী কিতাব সমূহের মূল কোরআন করীম যেমন মহা মর্যাদাবান কিতাব তেমনি এর ধারক ও বাহকও মর্যাদাবান হবেন। অন্যান্য কিতাবের বাহকগণ عبد (আব্‌দ) হতে পারেন কিন্তু 'কিতাব' সমূহে মূল কোরআন করীমের ধারক ও বাহক عَبْدُهٗ (আবদুহু)ই হবেন। এজন্যই এ আয়াতে عَبْدُهٗ (আবদুহু) বলে এরশাদ হয়েছে। এর বর্ণনা অবশ্য করা হয়েছে।

আমার এ বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, 'আব্‌দ' এবং 'আবদুহু' এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য অনুধাবন করা ছাড়া এ শব্দ দু'টোর সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব এবং এর প্রকৃত অর্থে বিকৃতি ও ত্রুটি হতে বাধ্য। এ কারণে 'আবদুহু' এর অর্থ 'দাস' বলা; আর এক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে নিজেকে অন্ধ অনুসারীদের বাহ্‌বা অর্জনের অপচেষ্টা করা সে বিকৃতি ও ত্রুটিরই ফলশ্রুতি বৈ আর কিছুই নয়। আল্লাহপাক এ ধরনের বিকৃত করণ ও ত্রুটি থেকে আমাদেরকে তথা সমস্ত মুসলমানদের রক্ষা করুন। আরো রক্ষা করুন সেসব শব্দের ব্যবহার থেকে যাতে শানে রেছালত অবমাননার প্রকাশ পায়। (নাউজু বিল্লাহ)

আরো স্মরণ রাখা দরকার যে, আমাদের আবদিয়াত এবং সম্মানিত নবীগণের (আঃ) আবদিয়াতের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন কোন নবী خلت বা খলিলুল্লাহ (আল্লাহর খাস বন্ধু) হবার মর্যাদা লাভ করেছেন, কেউ আবার تكلم বা কলীমুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি কথোপকথন করা) এর মর্যাদায় ভূষিত ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জনাব হুজুর মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম حبيت (হুব্বিয়াত) ও محبوبيت বা আল্লাহর খাস হাবীব ও মাহ্‌বুব হবার মহান মর্যাদা প্রদত্ত হয়েছেন। এ মর্যাদাটা خلت (খলীল হওয়া), تكلم (বা কালিমুল্লাহ হওয়া) ইত্যাদি মর্যাদা সমূহেরও ধারক। যেমন তিরমিজী শরীফ ও দারেমী শরীফের উদ্ধৃতি সহ মেশকাত শরীফে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন–

جَلَسَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ حَتّٰى اِذَا دَنٰى مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَقَالَ آخَرُ مُوْسٰى كَلَّمَه تَكْلِيْمًا وَقَالَ آخَرُ فَعِيْسٰى كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوْحُهُ وَقَالَ آخَرُ آدَمُ اِصْطَفَاهُ اللّٰهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ اَنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَمُوْسٰى نَبِيُّ اللّٰهِ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَعِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ وَآدَمُ اِصْطَفَاهُ اللّٰهُ وَهُوَ كَذٰلِكَ اِلَّا وَاَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ وَلَافَخْرَ وَاَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ مِنْ دُوْنِه وَلَافَخْرَ اِنْتَهٰى.

অর্থাৎ রছুল করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কতিপয় ছাহাবী বসে আলাপরত ছিলেন। তখন হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁর পবিত্র হুজরা শরীফ থেকে বাইরে তশরীফ নিলেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি তাঁদের নিকটে আসলেন তখন তিনি তাঁদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা শুনতে পেলেন। কোন কোন ছাহাবী বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে আল্লাহ তায়ালা 'খলীল' বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেউ বলেন, মূছা (আঃ) এর সাথে আল্লাহ তায়ালা কথোপকথন করেন। কেউ বললেন হযরত ঈসা (আঃ) হলেন রূহুল্লাহ্ বা খোদা প্রদত্ত 'রূহ' এবং তিনি একটা কলেমা كُنْ (কুন) দ্বারা তৈরী। আর কেউ বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)কে বেছে নিয়েছেন। (মোট কথা) ছাহাবায়ে কেরাম উপরোক্ত নবীগণের উল্লেখপূর্বক তাঁদের প্রশংসা করছিলেন। অতঃপর হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁদের নিকট তশরীফ নিলেন, আর এরশাদ করলেন আমি অবশ্যই তোমাদের আলোচনা এবং আশ্চর্য্যবোধক কথাবার্তা শুনেছি। (তোমরা বলেছ) 'হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর বন্ধু।' হ্যাঁ তিনি অনুরূপই। (তোমরা বলেছ) 'হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী। হ্যাঁ, অনুরূপই। (তোমরা আরো বলেছ)– হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর 'হুকুম' ও তাঁর 'রূহ'। অবশ্য তিনিও অনুরূপ।

(তোমাদের মন্তব্য ছিলো) 'আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)কে নির্বাচিত করেছেন' বস্তুতঃ তিনিও অনুরূপ। তোমাদের এসব মন্তব্য 'বরহক', নীরেট সত্য। তবে হুশিয়ার, মনোযোগ সহকারে শুন! 'আমি হলাম আল্লাহর 'হাবীব'। আমার এ দাবী অহংকারের ভিত্তিতে নয়। আর আমি হ'লাম আল্লাহর প্রশংসার পতাকা উড্ডয়নকারী। সেই পতাকার নীচে আশ্রয় নেবেন হযরত আদম (আঃ)এবং তাঁর পরবর্তী সব নবী (আঃ)।

কাজেই, একথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হচ্ছে যে, 'হাবীব' এমনি এক গুণ বা মর্যাদা যাতে শামিল রয়েছে খলীল, কলিম, নজী, ছফী (যথাক্রমে হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুছা ও হযরত আদম আলাইহিমুচ্ছালাম প্রমুখ নবীগণের হাসিলকৃত) মর্যাদাসমূহ। কাজেই স্মরণ রাখতে হবে যে, হাবীব বিশেষণটা হলো বহুবিদ বিশেষণের ধারক একটা শব্দ। মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) উল্লেখ করেছেন 'খলীলও' আল্লাহর বন্ধু, তবে আপন প্রয়োজনের তাগিদে। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আপন প্রয়োজন বা চাহিদা পুরনের নিমিত্ত আল্লাহর প্রতি শরনাপন্ন ছিলেন। এ অর্থে তিনি ছিলেন খলিলুল্লাহ। আর হাবীব (حَبِيْبٌ) فَعِيْلٌ এর সমোচ্চারিত শব্দ। فَاعِلٌ (কর্তাবাচক) এবং مفعول (কর্মবাচক) উভয় অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ হুজুর (দঃ) (اسم محب محبوب (مفعول) এবং فاعل)। বস্তুতঃ খলীল আল্লাহর দোস্ত আপন চাহিদা পুরনের জন্য, কিন্তু হাবীব আল্লাহর বন্ধু কোন প্রকার চাহিদা বা উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই। সুতরাং খলীল হলেন তালিব, ছালেক এবং মুরীদ (যথাক্রমে তলবকারী, শরীয়তের অনুসারী ও মুর্শিদের শিষ্যত্ব অবলম্বনকারী) এর স্থলাভিষিক্ত। আর হাবীব হলেন, মাতলুব, মাজযুব ও মোরাদ (যথাক্রমে তলবকৃত, স্বর্গীয় ধ্যানে নিমজ্জিত ও পথ প্রদর্শনকারী) এর ন্যায়ই। এজন্যই আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন–

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাঁকে চান তাঁর প্রতি চয়ন করে নেন এবং তাঁর প্রতি পথ প্রদর্শন করেন যিনি তাঁর প্রতি বিনীত হন।

'খলীল' তিনিই হয়ে থাকেন যাঁর কাজকর্ম হয় মুনিবেরই সন্তুষ্টি মোতাবেক। আর 'হাবীব' হলেন তিনি যাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেকই মুনিব কার্যাদি সম্পাদন করেন। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

অর্থাৎঃ অতঃপর আমি অবশ্যই আপনাকে ফেরাবো সেই কেব্‌লার দিকে যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে। এবং অবিলম্বে আপনার প্রভু আপনাকে দান করবেন। যাতে আপনি সন্তুষ্ট।

অনুরূপ, 'হাবীব' এর মাগফেরাত নিশ্চিত। আল্লাহপাক যে, তাঁর হাবীবকে এবং যাঁরা তাঁর উপর ঈমান এনেছেন তাঁদেরকে অপমানিত করবেন না তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

হাবীবের শান বা মর্যাদা সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে– وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ অর্থাৎঃ এবং আমি (আল্লাহ পাক) হে হাবীব! আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি। আরও এরশাদ হয়েছে, اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে 'কাওছার'দান করেছি। তাছাড়া হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে আল্লাহর মাহ্‌বুব হওয়ার শীর্ষ মর্যাদার অধিকারী এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো নিম্নলিখিত আয়াত–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰه.

অর্থাৎঃ 'হে হাবীব! আপনি বলে দিনঃ (হে বিশ্ববাসী)! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালবাস তবে আমারই অনুসরণ কর। তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।'

বস্তুতঃ এ আয়াতটা মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) বর্ণিত সব ক'টি অভিমতের সার সংক্ষেপ।

তাছাড়া, 'খলীল' হলেন বহিরাগত বন্ধুর ন্যায়। কাজেই, তিনি 'শাফায়াতে কোব্‌রা' বা চূড়ান্ত সুপারিশের মালিক হবেন না। কারণ বহিরাগত বন্ধু বস্তুতঃ এ ধরনের সুপারিশ করতে পারেন না। আসলে সুপারিশ করতে

পারেন 'হাবিবুল্লাহ' বা অতি ঘনিষ্ট বন্ধু। এজন্যই হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম 'শাফায়াতে কোবারা' বা চূড়ান্ত সুপারিশের মালিক। অতি ঘনিষ্ট বন্ধুসূলভ নির্জনতা শুধু 'মাহ্বুবে'র সাথেই হয়ে থাকে। মাহ্বুবই হলেন বিশেষতম ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। বস্তুতঃ সমস্ত নবী (আঃ) আল্লাহ্পাকের বন্ধু। কিন্তু হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন খাস নির্জনতার ঘনিষ্টতম মাহ্বুব বা বন্ধু। এজন্যই হযরত মুছা (আঃ) এর সাথে আল্লাহ তায়ালা সীনাই মালভূমিতে যেসব কথোপকথন করেছেন সবগুলো আপন মাহ্বুব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নিকট ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু মে'রাজ শরীফের নির্জন বৈঠকে আল্লাহপাক আপন মাহ্বুবের সাথে যেসব খাস কথাবার্তা বলেছেন সেগুলো কাউকে বলেননি। শুধু এতটুকুই এরশাদ করেছেন–

فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى

অর্থাৎঃ তিনি আপন খাস বান্দা বা মাহ্বুবের সাথে সেসব গোপন কথাবার্তা বলেছেন, যেগুলো গোপনে বলার ছিলো। সেগুলো ছিলো নির্জন বৈঠকের বন্ধুত্বসূলভ কথাবার্তা।

হযরত ঈসা আমাদের প্রিয় নবী হুজুর আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরই একজন খাস সুসংবাদ দাতা। পূর্বেও তিনি সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতেও দেবেন। তিনি সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন–

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اِسْمُهٗ أَحْمَدُ

অর্থাৎঃ এমনি এক মহান রাছুলের সুসংবাদ দাতা, যিনি আমার (হযরত ঈসা আঃ) পরে আসবেন, তাঁর নাম হবে 'আহমদ'। (মিরআত ইত্যাদি)

'নুজহাতুল মাজালেছ' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়– একদিন হযরত মুছা (আঃ) আল্লাহ্পাকের দরবারে আরজ করলেন, হে খোদা আপনি আমাকে 'কলীম' বা তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ দানে ধন্য করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে হাবীবের মর্যাদা দিয়েছেন এ দু'টো মার্যাদার মধ্যে পার্থ্যক্য কি? আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন– 'কলীম' এমন কাজ করবেন যাতে আমর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর 'হাবীব' হলেন তিনি,

যাকে আমি খোদ্ খোদা তায়ালা আপন খাস বন্ধু হিসেবে বরণ করে নিয়েছি। 'কলীম' দিনে রোজা রাখবেন এবং রাত্রে এবাদত করবেন। চল্লিশ্ দিন এ'ভাবে অতিবাহিত করার পর সীনাইর 'তূর' এ আসবেন এবং আমার সাথে কথা বলবেন। আর 'হাবীব' আপন বিছানার উপর আরামে ঘুমাবেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) গিয়ে অতি আদরের সাথে তাঁকে ঘুম থেকে জাগ্রত করবেন। আর বোরাকের উপর ছওয়ার করে আল্লাহর দরবারে নিয়া আসবেন। তারপর আমি তাঁকে এমন মহান মর্যাদা সমূহের অধিকারী করবো যেগুলোর হাকীকত অনুধাবন করা কারো জন্য সম্ভব পর হবে না।

সম্মানিত পাঠক ভাইদের একথা অবশ্যই প্রতিভাত হয়েছে যে, 'আবদুহু' বা হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আবদিয়াতের হাকীকত যথাযথভাবে অনুধাবন করা কোন মাখলুকের পক্ষে সম্ভব নয়। মোটকথা 'আবদুহু' তিনিই, যাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেকই মুনিবের কাজসমাধা হয়। আর 'আব্দ' হলো যার কাজকর্ম মুনিবের সন্তুষ্টি মোতাবেকই হয়ে থাকে। যেমন মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) এর মন্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য ছিল–

اَلْحَبِيْبُ فَعِيْلٌ بِمَعْنَى الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُوْلُ فَهُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِبٌّ وَمَحْبُوْبٌ فَاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ اِفْتِقَارُهُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى فَمِنْ هٰذَا الْوَجْهِ اِتَّخَذَهُ خَلِيْلاً اَلْخَلِيْلُ يَكُوْنُ فِعْلُهُ بِرِضَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْحَبِيْبُ يَكُوْنُ فِعْلُ اللّٰهِ لِرِضَاهُ.

অর্থাৎঃ حَبِيْبٌ – فَعِيْلٌ সমুচ্চারিত শব্দ। اسم فاعل (কর্তাবাচক) ও مفعول (কর্মবাচক) উভয় হতে পারে। সুতরাং হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যথাক্রমে محب (বন্ধুত্ব স্থাপনকারী) এবং محبوب (বন্ধু) উভয় বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত। সুতরাং ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রয়োজন বা চাহিদা ছিল আল্লাহর প্রতি এ অর্থের প্রেক্ষিতে আল্লাহপাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে 'খলীল' হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'খলীল' এর কাজ হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী এবং আল্লাহর কাজ হয় হাবীবের সন্তুষ্টি মোতাবেক।

হাদীছে কুদ্‌ছীতে বর্ণিত আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেছেন–

قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّهُمْ يَطْلُبُوْنَ رِضَائِىْ وَاَنَا اَطْلُبُ رِضَاكَ يَامُحَمَّدُ.

অর্থাৎঃ সমস্ত নবী তথা সমস্ত সৃষ্টি আমার সন্তুষ্টি চায়। কিন্তু হে মুহাম্মদ! আমি তোমরাই সন্তুষ্টি চাই।

خداکے رضا چاهتی هیں دوعالم

خدا چاهتاهے رضائے محمد صلعم

অর্থাৎঃ উভয় জাহান খোদার সন্তুষ্টি চায়, আর খোদা চান মুহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সন্তুষ্টি– এটাই হলো–عبد (আবদ) এবং 'আবদুহু' (عَبْدُهٗ) এর মধ্যেকার পার্থক্য।

আফসোস! এ জমানার কিছু আলেম নামধারী মূর্খ ব্যক্তি 'নবী' ও 'রছুল' এর অর্থ বলতে গিয়ে বলে তাঁরা হলেন 'দুত' ও বার্তাবহক মাত্র। অথচ এ দু'টো শব্দও আরবী পরিভাষায় منقول عرفی অর্থাৎ শরীয়তের পরিভাষায় এ দু'টো শব্দ আভিধানিক অর্থ থেকে অন্য অর্থে পরিবর্তিত হয়েছে। যেমন دابة صلوة ইত্যাদি। (এ শব্দগুলো শরীয়তের পরিভাষায় আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত নয়, বরং পরিবর্তিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।

কারণ, আভিধানিকভাবে 'নবী' মানে সংবাদ দাতা, সংবাদ প্রাপ্ত, সুপ্রশস্থ রাস্তা, একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর গ্রহণকারী, এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে যাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, গোপন ও অস্পষ্ট শব্দ শ্রবণকারী, প্রকাশ্য এবং উচ্চতা ও উন্নতি সম্পন্ন ব্যক্তি এ আটটা অর্থই অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় নবী সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহাপুরুষকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ তায়ালার এমনি পছন্দনীয় এবং চয়নকৃত হন যে তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌পাক এরশাদ করেন– আমি আপনাকে অমুক গোত্র কিংবা সব লোকের প্রতি আমার প্রচারক ও বার্তাবাহক (ওহী) হিসাবে মনোনীত করেছি। এবং আমার পক্ষ থেকে আমার বান্দাদেরকে আমারই নির্দেশনাবলী পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছি। শরহে মাওয়াকেফে উল্লেখ করা হয়–

مَنْ قَالَ لَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِمَّنِ اصْطَفَاهُ مِنْ عِبَادِهٖ اَرْسَلْنَاكَ اِلٰى قَوْمٍ كَذَا اَوْ اِلَى النَّاسِ جَمِيْعًا اَوْ بَلِّغْهُمْ عَنِّىْ

অর্থাৎঃ যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন- তিনি আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁকে বেছে নিয়েছেন। 'হে হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম !আমি আপনাকে এমন গোত্রের প্রতি প্রেরণ করেছি।" কিংবা সমস্ত মানব জাতির প্রতি (প্রেরণ করেছি) কিংবা (এরশাদ করেছেন) হে হাবীব! আপনি আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে পৌছিয়ে দিন।

আর নবুয়ত (نبـــوت) মানে শরীয়তের পরিভাষায়- আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া। আল্লামা কাজী আয়াজ, আল্লামা কোস্তালানী (রঃ) প্রমুখ 'অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করণ বলেও (نبوت) নবুওয়ত এর ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন উল্লেখ করেছেন-

اَلنُّبُوَّةُ الَّتِىْ هِىَ الْاِطْلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ

অর্থাৎঃ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে খবর দেয়াই হলো নবুওয়ত। তাছাড়া 'নবী' (نبى) শব্দের উল্লেখিত আটটা অর্থই পারিভাষিক 'নবীর' মধ্যে পাওয়া যায়।

"مـســامـره" নামক কিতাবে এ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সারবস্তু হলো نبى (নবী) শব্দের মূল همزه দ্বারা গঠিত। অথাৎঃ نباء থেকে উদ্ভুত। نباء এর অর্থ 'খবর। এতদভিত্তিতে نبى শব্দটি فـعـيـلএর সমুচ্চারিত اسم فـــاعـل (কর্তাবাচক বিশেষ্য)। এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদদাতা কিংবা اسم مفعول (কর্মবাচক বিশেষ্য)। তখন এর অর্থ হবে- (نبى) শব্দটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রাপ্ত। যেমন, ফেরেস্তা 'নবী'কে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ওহীর' মাধ্যমে সংবাদ দিয়ে থাকেন।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো- نبى শব্দের ধাতুতে همزه (হামজাই) নেই। এতদভিত্তিতে نبى শব্দটিকে همزه সম্বলিত (مـهـمـوز) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ (مـخـفـف) বলতে হবে। অর্থাৎঃ এর হামজা (همـزه) (و) واؤ তে পরিবর্তিত হবে। অতঃপর প্রথম ى কে واؤ থেকে পরিবর্তিত হয় ى তে

ادغام বা যুক্ত করা হয়েছে।

কিংবা نبوت (নবুওয়ত) نبوة বা (نباوة) থেকে গৃহীত। এ দু'টি ধাতুতেই نون (নুন) যবর فتحه সম্বলিত। তখন এর অর্থ হবে ارتفاع বা 'উচ্চ হওয়া, এতদ্ভিত্তিতেও 'নবী' (نبی) শব্দটি فعيل এর সমুচ্চারিত اسم فاعل কিংবা اسم مفعول হবে। কেননা, 'নবী অন্যান্যদের তুলনায় উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। কিংবা মর্যাদা অনুসারে তাঁদের মান উন্নত করা হয়। যেমন, উল্লেখ করা হয়–

اَلنَّبِی مُرْتَفِعُ الرُّتْبَةِ عَلٰی غَيْرِهٖ اَوْ مَرْفُوْعُهَا (مسامره)

অর্থাৎঃ 'নবী অন্যান্যদের তুলনায় উচ্চতর মর্যাদাবান হন, কিংবা তাঁদের মান উন্নততর করা হয়।'

'নিব্‌রাছ' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয় مشتق منه (ধাতু) অনুসারে 'নবী (نبی) শব্দের তিনটি অর্থ হতে পারে। যথা– (১) مخبر (সংবাদ দাতা), (২) ظاهر الحقيقة (যাঁর হাকীকত প্রকাশ্য) ও (৩) سامع الوحی (ওহী শ্রোতা)। এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই 'নবী' (نبی)এর মধ্যে বিদ্যমান। কেননা– 'নবী' যেমন সংবাদ দাতা তেমনি নবুওয়তের চিহ্ন সমূহ সহকারে অর্থাৎ 'নবী' হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে সুপ্রকাশ্য হাকীকত সম্বলিত এবং ওহী শ্রবণকারী হয়ে থাকেন।

'শরহে মাওয়াকেফ নামক আকায়েদ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়–

هُوَ لَفْظٌ مَنْقُوْلٌ فِی الْعُرْفِ عَنْ مُسَمَّاهُ اللُّغَوِیْ اِلٰی مَعْنٰی عُرْفِیْ

অর্থাৎঃ 'নবী শব্দটা আভিধানিক অর্থ থেকে পারিভাষিক অর্থের দিকে পরিবর্তিত।'

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, نبی (নবী) نباء থেকে গৃহীত হওয়ার ভিত্তিতে এর অর্থ হয় সংবাদদাতা। তখন শব্দটা হবে مهموز বা হামজাহ্

সম্বলিত। তবে তা সংক্ষিপ্ত (مخفف) ও যুক্ত (مدغم)। এ অর্থটা সে পবিত্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিদ্যমান, যিনি 'নবী' হিসেবে খ্যাত। কেননা, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী, 'নবী' (نبى) نبوة থেকে গৃহীত। এর অর্থ হলো 'উচ্চ হওয়া'। যেমন আরবে বলা হয় تنبى فلان অর্থাৎ অমুক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছে। এ উক্তিটা তখনই করা হয় যখন কোন ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়। আর রছুল ও নবী সম্পর্কে বর্ণিত

وَالرَّسُوْلُ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَوْصُوْفٌ بِذَالِكَ لِعُلُوِّ شَانِهٖ وَسُطُوْعِ بُرْهَانِهٖ.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার রছুল তথা নবী আপন মর্যাদায় উন্নত হওয়া ও নবুওয়তের দলীলাদি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার কারণে উক্ত পূর্ণতা দ্বারা গুণান্বিত হয়ে থাকেন।

তৃতীয় অভিমত হলো 'নবী' সে نبى (নবী) শব্দ থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ হলো– الطريق বা সুপ্রশস্থ রাস্তা। لِاَنَّهٗ وَسِيْلَةٌ اِلَى اللّٰهِ কারণ নবী বা রছুলই আল্লাহর প্রতি পৌছার যথোপযুক্ত মাধ্যম। এজন্যই 'নবী' স্বীয় গন্তব্যস্থলে পৌছার সুপ্রশস্থ রাস্তার সমতুল্য। তাঁর (নবী) পবিত্র স্বত্ত্বা হলো– আখিরাতে মুক্তির জন্য সমুজ্জ্বল রাস্তা; খোদার মারেফাত হাসিলের জন্য উপযুক্ত মাধ্যম। এ প্রেক্ষিতেও নবী বা রছুল সুপ্রকাশ্য রাস্তার ন্যায়। তদুপরি وَاصِل بِاللّٰهِ (আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত), فَنَا فِى اللّٰهِ (আল্লাহ্তে আত্মবিলীনকারী) ও بَقَا بِاللّٰهِ (আল্লাহর মহিমায় স্থায়িত্বশীল) হওয়ার উছিলা বা মাধ্যম হলেন 'নবী' বা রছুল।

'ইমাম রাগেব' তাঁর 'আল-মুফরাদাতে' লিখেছেন– 'নবী'কে নবী এজন্যই বলা হয় যে,

لِرِفْعَةِ مَحَلِّهٖ عَنْ سَائِرِ النَّاسِ اَلْمَدْلُوْلُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

অর্থাৎ নবীর মর্যাদা অন্যান্য সব মানুষের তুলনায় উচ্চতর। প্রমাণ স্বরূপ,

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন– 'আমি তাঁকে (নবী) উন্নততর মর্যাদা দান করেছি। 'ফতুহাত'-এ উল্লেখ করা হয়–

اَلنَّبِيُّ هُوَ الَّذِىْ يَأْتِيْهِ الْمَلَكُ بِالْوَحْىِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يَتَضَمَّنُ ذٰلِكَ الْوَحْىُ شَرِيْعَةً يَتَعَبَّدُبِهَا فِىْ نَفْسِهٖ فَاِنْ بُعِثَ بِهَا اِلٰى غَيْرِهٖ كَانَ رَسُوْلاً.

অর্থাৎঃ 'নবী' এমন ব্যক্তিত্বকে বলা হয় যাঁর প্রতি ওহী সূত্রে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নাজিল হয়। আর এ শরীয়ত দ্বারা আল্লাহপাকের এবাদতের ধরণ (বা নিয়ম কানুন) সুস্পষ্ট হয়। আর যখনি এ মর্মে নির্দেশিত হন যে, 'আপনি এ শরীয়ত মানুষের নিকট পৌছিয়ে দিন' তখন তাঁকে রছুল' বলে অভিহিত করা হয়।

ফতুহাতে 'মক্কীয়াহ্'তে বর্ণিত হয়– নবী হচ্ছেন তিনি, যাঁকে ওহী সূত্রে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শরীয়ত দান করা হয়েছে, এ শরীয়তের তাবেদারী করা তাঁর নিজের উপরও অপরিহার্য। আর যদি তিনি সে শরীয়ত সহকারে অন্যান্য মানুষের প্রতিও প্রেরিত হন তবে তাঁকে রছুল বলা হয়।

কোন কোন ইমাম অভিমত প্রকাশ করেছেন–

(اَلنَّبِيُّ) اَلْخَارِجُ مِنْ مَكَانٍ اِلٰى مَكَانٍ

অর্থাৎঃ 'এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে যে ব্যক্তি বের হয় তাকেও নবী বলা হয়। যেমন, আল্লাহ তায়ালার 'নবী' তাঁর শত্রুদের দ্বারা নির্যাতন হয়ে আল্লাহরই নির্দেশে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বের হয়ে পড়েন। কিংবা, কাফেরদের পক্ষ থেকে অকথ্য শত্রুতার ভিত্তিতে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে বের করে দেয়ার নির্দেশকে বাস্তবায়িত করেন। আশ্শেখ আল-মোহাক্কেক আল-আল্লামা আল-কাজেমী ছাহেব (রহঃ) শায়খুল হাদীছ, আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান এ অভিমতের প্রবক্তা।

'শাওয়াহেদুন্নবুওয়াত'-এ উল্লেখিত–

اِعْلَمْ اَنَّ النَّبِيَّ عِبَارَةٌ عَنْ اِنْسَانٍ اُنْزِلَ عَلَيْهِ شَرِيْعَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ بِطَرِيْقِ

اَلْوَحْيِ تَتَضَمَّنُ تِلْكَ الشَّرِيْعَةُ بَيَانَ كَيْفِيَةِ تَعَبُّدِهٖ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَاِذَا اُمِرَ بِتَبْلِيْغِهَا يُسَمّٰى رَسُوْلاً.

অর্থাৎঃ 'জেনে রাখ! নিশ্চয়ই নবী সে মহান ব্যক্তিকে বলা হয় যাঁর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী সূত্রে এমন শরীয়ত নাজিল হয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত বন্দেগীর নিয়ম-কানুন সুস্পষ্ট হয়। আর তিনি যদি সে শরীয়তের নির্দেশাবলী অন্যান্যদের প্রতি পৌছিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশিত হন তবে তাঁকে রছুল বা নবী বলা হয়।

رَسُوْلٌ (রছুল) رِسَالَةٌ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ হয়ত প্রেরিত নতুবা اِرْسَالٌ অর্থে, প্রেরণ করা। রেছালত এর অন্য অর্থ 'পয়গাম' ও চিঠি। এর বহুবচন رسالات , رسائل

শরীয়তের পরিভাষায় 'রেছালত' এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ–

هِيَ سَفَارَةُ الْعَبْدِ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ ذَوِى الْاَلْبَابِ مِنْ خَلِيْقَةٍ لِيُزِيْحَ بِهَا عِلَلَهُمْ فِيْمَا قَصُرَتْ عَنْهُ عُقُوْلُهُمْ مِنْ مَّصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. (شرح العقائد)

অর্থাৎঃ 'রেছালত' হলো আল্লাহ্পাক এবং তাঁর সজ্ঞান সৃষ্টির মাঝখানে মধ্যস্থতা, দৌত্যকার্য, যা তাদের সেসব রোগ-ব্যধি দূরীভূত করে দেয় যেগুলোর কারণে তাঁদের জ্ঞান ও বিবেক সমূহ পার্থিব ও পরলৌকিক মঙ্গলজনক কার্যাদি থেকে অক্ষম হয়ে যায়।' (শরহে আকায়েদ)

তাছাড়া, ওলামায়ে কেরাম তথা ইমামগণ বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ.

অর্থাৎ 'রছুল' সেই মহান ব্যক্তি, যাঁকে আল্লাহ্পাক সৃষ্টির প্রতি তাঁর নির্দেশাবলী পৌছিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন।

ইব্নে তাইমিয়ার অভিমত হলো– তিনিই রছুল যাঁকে সে ব্যক্তির প্রতি পাঠানো হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে। যেন তিনি

তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেন। হযরত আল্লামা কাজী বায়জাবী (রঃ) উল্লেখ করেন।

اَلرَّسُوْلُ مَنْ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِشَرِيْعَةٍ مُجَدِّدَةٍ يَدْعُوْ النَّاسَ اِلَيْهَا

অর্থাৎঃ রছুল হলেন তিনি, যাঁকে আল্লাহপাক নতুন শরীয়ত সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি মানুষকে এর প্রতি আহ্বান করেন।

ইমাম ইবনে হুম্মাম (রহঃ) তাঁর "مسامره"তে লিখেছেন–

وَاَمَّا عَلٰى مَاذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُوْنَ مِنْ اَنَّ النَّبِيَّ اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ لِتَبْلِيْغِ مَااَوْحٰى اِلَيْهِ وَكَذَا الرَّسُوْلُ فَلَا فَرْق.

অর্থাৎঃ তবে বিজ্ঞ আলেমগণ যা উল্লেখ করেছেন– নবী হলেন সেই মহান ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তায়ালা এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, যা কিছু তাঁর প্রতি ওহী সূত্রে অবতরণ করা হয়েছে তা পৌঁছিয়ে দেবেন। 'রছুল'ও অনুরূপ। এতদভিত্তিতে,উভয় শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

টীকাঃ জেনে রাখা দরকার–

যে ব্যক্তি হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নবুওয়তের মধ্যে মতভেদ ও সন্দেহ পোষণ করে সে ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। কেননা নবুওয়ত নিয়ে মতভেদ ও সন্দেহ পোষণ করা কোন মুসলিমের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আসুন, আমরা এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি। যে সমস্ত ব্যক্তি হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে এলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী নন বলে ধারণা করে সেসব ব্যক্তিই হুজুরের নবুওয়তকে তো স্বীকার করে থাকে। নবুওয়তকে মেনে নেওয়ার অর্থ হুজুরের এলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানকে মেনে নেয়া। কারণ নবুওয়ত অর্থ খবর বা সংবাদ দেওয়া। উপরে তার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এইসব সংবাদ দেওয়ার জন্য হুজুর আবির্ভুত নন এবং এগুলোর তত গুরুত্বও নেই। যেসব সংবাদ আমরা পরস্পরকে দিয়া থাকি। যেমন সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়, পানি পিপাসা নিবারণ করে, আগুণে জ্বালায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ সংবাদ প্রতিটি মানুষই দিতে পারে বা দিয়া থাকে। কিন্তু তাদেরকে নবী

বলা হয় না। অতএব বুঝা গেল, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে সংবাদ বা খবর দিচ্ছেন সে সংবাদ বা খবরের রূপ সাধারণ মানুষের সংবাদের চেয়ে ভিন্ন। নবীর সংবাদ ঐ সমস্ত সংবাদের পর্যায়ভুক্ত যে সংবাদ আমাদের জ্ঞানালোকের বহির্ভূত। যে সমস্ত সংবাদ মানুষের জ্ঞানালোক বহির্ভুত হয় তাকেই এলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলে। ইহা হতে প্রমাণিত হলো, যে ব্যক্তি হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে নবী মানে তাকে হুজুরের এলমে গায়েব মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ হুজুরকে নবী স্বীকার করার অর্থই হলো এলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান স্বীকার করা, নচেৎ নবী স্বীকার করাই হবে না।

হ্যাঁ, তবে যদি কেহ এলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞানকে ইনকার করতে গিয়ে হটকারীতার আশ্রয়ে হুজুরের নবুওয়তকে ইনকার করে তাহলে এটা অন্য কথা। কিন্তু যেসব মুসলমান হুজুরকে নবী স্বীকার করেছেন হুজুরের এলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান মেনে না নেওয়ার সকল পথ তাদের জন্য রুদ্ধ। যেমন পূর্বে তার বিশদ আলোচনা রয়েছে।

"ارسال" (ইরছালুন্) একটা ব্যাপক শব্দ। যেমন ارسال ملائكة (ফেরেস্তা প্রেরণ), ارسال رياح (বায়ু প্রবাহ প্রেরণ), ارسال نار (আগুণ প্রেরণ) এবং ارسال الشياطين (শয়তান প্রেরণ) ইত্যাদি স্থানে ارسال শব্দের ব্যবহার হয়। কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকেও এ ব্যাপকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু যখন 'রছুল' শব্দটা আল্লাহর সাথে مضاف (সম্বলিত) হয়ে ব্যবহৃত হয়, যেমন رَسُوْلُ اللّٰهِ (রছুলুল্লাহ্) বলা হয়, তখন সে 'রছুল' বলতে শুধু তাঁকে বুঝানো হয়ে থাকে যিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পয়গাম নিয়ে আগমন করেন– তিনি ফেরেস্তা হোন কিংবা মানুষ হোন। আর সাধারণতঃ ফেরেশতাগণ, বায়ুর প্রবাহএবং জ্বীন জাতিকে প্রেরণ করা হয় কোন কাজ সমাধা করার জন্য; রেছালতের দায়িত্ব পালনের জন্য নয়। যেমন– এরশাদ হয়েছে–

اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا

অর্থাৎঃ 'যখন তোমাদের উপর সৈন্য সমূহ হামলা করে বসে তারপর আমি

তাদের উপর বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করেছি এবং সেসব ফৌজ যাদেরকে তোমরা দেখনি।'

সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার যেই রসূল আল্লাহরই পক্ষ থেকে বিধি-নিষেধের বাণী পৌঁছিয়ে দেন সাধারণ অর্থে তিনিই হলেন মহান সম্মানিত 'রছুল'।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন– নবীগণ (আঃ) দুই প্রকারের হয়ে থাকেন। যথা (১) عبد رسول (আবদ রছূল) ও (২) نبى ملك (নবী মালেক বা বাদশাহ নবী)। আল্লাহ তায়ালা হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে উভয় প্রকার অবলম্বন করার ইখতিয়ার দিয়েছিলেন। হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম 'আবদ-রছুল' হওয়াকেই পছন্দ করেন। সুতরাং 'নবী-মালেক' যেমন হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং তাঁদের ন্যায় যাঁরা ছিলেন।

কাজেই 'নবী মালেক' (বা বাদশাহ নবী) এর উপর যা 'ফরজ' বা অপরিহার্য করে দেয়া হয় তিনি তা পালন করেন। আর যা হারাম বা নিষেধ করে দেয়া হয় তা থেকে বিরত থাকেন। তাছাড়া, বাদশাহী, গভর্ণর পদ ইত্যাদি এবং ধন-দৌলতের ক্ষেত্রে তাঁরা যেভাবে চান সেভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। এতে তাঁদের কোন গুনাহ হত না। কিন্তু 'আবদ-রছুল' (বা বান্দা-রছুল) আপন প্রতিপালকের নির্দেশ বা অনুমতি ব্যতিরেকে কাউকেও কিছুই দিতেন না। আর এমনও করতেন না যে যাকে চান দান করেন এবং যাকে চান বঞ্চিত রাখেন। বরং যাকে কিছু দান করার জন্য প্রতিপালক নির্দেশ দেন, কিংবা যাকে বাদশাহী ইত্যাদি দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন তাকে তাই দান করেন। মোটকথা তাঁর সমস্ত কাজই আল্লাহরই এবদাতের শামিল। সুতরাং রসুলের দান আল্লাহর দানের এবং রছুলের কাজ আল্লাহর কাজেরই নামন্তর মাত্র। বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন–

إِنِّىْ وَاللّٰهِ لَاأُعْطِىْ اَحَدًا وَلَا اَمْنَعُ اَحَدًا اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ.

অর্থাৎঃ 'খোদার কছম! আমি না কউকে দান করি, কাউকে না বঞ্চিত করি, নিশ্চয়ই আমি বন্টনকারী, যা যেখানে রাখার নির্দেশ দেয়া হয় তা আমি সেখানেই রেখে থাকি।' এজন্যই আল্লাহপাক শরীয়তগত মাল সমূহকে

খোদ্ নিজের দিকে এবং তাঁর রছুলের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। (কিতাবুন্নবুয়াত, লোগাতুল কোরআন ইত্যাদি)।

এখানে 'আবদ-রছুল' মানে সর্বাধিক 'উত্তম' পরিপূর্ণ ও সম্মানিত রছুল। 'রছুল' ও 'নবী'র মধ্যে কি ধরনের 'সম্পর্ক' সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবিরোধ রয়েছে। এ প্রসঙ্গটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কাজেই এখানে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা থেকে বিরত রইলাম। এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের নানাবিধ অভিমত অন্যস্থানে আলোচনা করবো ইন্শাআল্লাহ।

হযরত আদম (আঃ)কে আল্লাহপাক ফেরেশ্তাদের মাধ্যম ব্যতীত নিজের হাতেই তৈরী করছেন, এজন্যই তাঁকে বশর বলা হয়। যেমন– আল্লাহপাক বলছেন– لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ অতএব, আল্লাহ নিজের হাতের তৈরী কৃত সত্ত্বা বা জাতকে আল্লাহর مُبَاشِرَتٌ بِالْيَدِ অর্থাৎ সংস্পর্শ হাত থেকে مشتق বা উৎপত্তি হয়।

সুতরাং আমার উপরোক্ত বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হলো যে, 'রছুল' ও 'নবী' নিছক 'দুত' কিংবা সংবাদদাতা নন বরং 'রছুল' ও 'নবী' হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি সৃষ্টির জাহের ও বাতেনকে দুরস্তকারী হন। প্রত্যেক প্রকার নাপাক বা অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্র করেন; নানাবিধ অন্ধকার থেকে বের করে নূরের দিকে স্থানান্তরকারী হন এবং আল্লাহর মারেফত, নৈটক্য এবং আল্লাহর ঘনিষ্টতা সহকারে সফলতা প্রদানকারী হন। 'নবী' ও 'রছুল' নিছক দুত কিংবা বার্তাবাহক অবশ্যই নন। তাছাড়া, 'নবী' ও 'রছুল' জমীনে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। যেমন তফসীরে বায়জাবীতে উল্লেখ করা হয়।

كُلُّ نَبِيٍّ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ 'প্রত্যেক নবী পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি।'

আমাদের আক্বা (মুনিব, হুজুর ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তো নবীকুল শ্রেষ্ঠ। কাজেই তাঁর প্রতিনিধিত্ব জ্বীন, ইনসান, ফেরেশতাকুল, বৃক্ষ লতা ও মাটি-পাথর ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ত। তদুপরি, 'রছুল' ও 'নবী' হলেন তিনিই, যিনি

সৃষ্টিকর্তা থেকে ফয়েজ, বরকত ও রহমত ইত্যাদি মখলুকের দিকে পৌছিয়ে দেন এবং সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যখানে উছিলা বা মাধ্যম হন। (বহু ওলামায়ে কেরামেরই এ অভিমত)

وهابی گرچه اخفا می کند بغض نبی لیکن

نهاں کے ماند آں رازلے کزو سازند محفلها.

অর্থাৎঃ এ যুগের ওহাবী মুনাফিকরা গোপনে গোপনে নবীজির দুশমনী করে, সমাজে প্রকাশ করে না কিন্তু তাদের এ দুশমনী গোপন থাকতে পারে না কেননা তাদের এসব সমাজ সম্মুখে তুলে ধরার জন্যই মাহফিল ও সম্মেলন ডাকা হয়। শাফেয়ী মাজহাবের কিতাব 'হাশীয়ায়ে বাইজুরী' তে আছে, যে ব্যক্তির যতগুলো ছেফাত বা গুণ থাকবে তার ততগুলো গুণবাচক (صفاتی) নাম থাকবে। তাই আমাদের প্রিয় নবীজির ৮০ হাজার নাম আছে, তা এজন্য যে, তিনি প্রত্যেক মাখলুকের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন আর মাখলুকের সংখ্যা ৮০ হাজার। (ফতোয়ায়ে নায়িমীয়া)

পূর্বে বলা হয়েছে গোলাম (عبد) তিন প্রকার তম্মধ্যে আবদে মাজুন (عبد مازون) এমন গোলামকে বলা হয় যাকে মালিক নিজের কারবারে পূর্ণ ইখতিয়ার প্রদান করে, তখন গোলামের কাজকে আসল মালিকের কাজ বলিয়াই গণ্য করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে আবদে মাজুনের অর্থ হবে নবীগণ ও ওলীগণ তাদের মাঝে কিন্তু ইমাম এবং সর্দার হলেন জনাব মুহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর শান অন্যতম, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আবদে মাজুন, সংশ্লিষ্ট বর্ণনার ফল এটাই দাড়ালো যে, সকল জগতের এটাই প্রকৃত মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কারবারে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করে উভয় জগতের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেই ইমাম আহমদ রেজা খান আলাইহির রহমত বলেছেন–

خالق کل نے آپکو مالك کل بنادیا

دونوں عالم آپکے قبضه واختیار میں هے

খালেকে কুলনে আপকো মালেকে কুল বানা দিয়া
দোনো আলম আপকে কবজা ও ইখতেয়ারমে হায়।

অর্থাৎঃ বিশ্ব প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহপাক জনাবে মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে সৃষ্টি জগতের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন।

অতএব, ইহ জগত ও পর জগত সম্পূর্ণভাবে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আয়ত্বাধীন। এখন যদি কোন নির্বোধ বলে সেটাত একজন কবির কবিতার শ্লোক মাত্র, সেটা আমরা মানি না। তার উত্তর এই যে কবিতাটি হাটে বাজারে কোন গায়কের নয় বরং উহা বিখ্যাত ও বিজ্ঞ আলেমের কালাম, তিনি গবেষণা শাস্ত্রের বিরাট অধ্যায়কে দু'এক শব্দ দ্বারাই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর এ কাব্যাংশ গুঢ় রহস্যের ভাণ্ডার।তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন আলেমগণই তা অনুধাবন করতে পারবেন। আল্লাহপাক তাওফীক দান করলে জনাব মুস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর রূপক অধিকার প্রাপ্ত(مجازی)মালিক হওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া যাবে, এখানে আনুসাঙ্গিক কিছুটা আরজ করা গেল।

এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো– মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন–عَبْدُهٗ (আবদুহু); যা অলংকার শাস্ত্রের আলোকে وصل(পূর্ব বাক্যের সাথে সমন্বিত); فصل পূর্ববর্তী বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যেমন, দেখুন! কলেমা শরীফে اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এখানে اِلَّا اللّٰهُ তে হরকত رفع (পেশ)। এবং مُحَمَّدٌ তেও 'মীম' ও 'দাল' এর হরকত رفع (পেশ)। اَللّٰهُ (আল্লাহু) শব্দের رفع পেশ এবং محمد এর 'মীম' এর উভয়ই رفع পরস্পর وصل ।

তাছাড়া, শাব্দিকভাবেও পরস্পরের মধ্যে কোন অব্যয় পদ নেই, যা দ্বারা উভয় বাক্যের মধ্যে فصل বা বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ ঘটে। বরং অব্যয় দ্বারা সমন্বিত না হওয়ার দরুন একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের মধ্যে فصل বা বিচ্ছিন্নতা নেই বরং রয়েছে وصل বা ঘনিষ্ঠতা।

আমার এ উপরোক্ত বর্ণনায় এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে,

মুহাম্মদুর রছুলুল্লাহ হলেন عَبْدُهٗ (আবদুহু); যাঁর আবদিয়াত (বান্দা হওয়া) অদ্বিতীয় ও অনুপম যেমনি, আল্লাহ পাক স্বীয় স্বত্বাগত দিক দিয়ে ও মা'বুদ বা উপাস্য হবার প্রেক্ষিতে অনুপম ও অদ্বিতীয়। সংক্ষেপে একথাই বুঝে নিন যে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের 'মাবুদ' বা উপাস্য হলেন খোদা তায়ালা এবং সে জাতে ওয়াহদাহুর অদ্বিতীয় বান্দা হলেন হযরত মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ।এ হাকীকতের যথাযথ অনুধাবন করা আমরা, আপনারা কারো জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব নয়। মোটকথা সমস্ত মাখলুক (সৃষ্ট)ই হযরত মোস্তফা ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরই পবিত্র কদমের নীচে।

বস্তুতঃ আমার এ লেখা কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বা কারো অবমাননা করার উদ্দেশ্যে নয় বরং সত্য প্রকাশেরই নিমিত্ত। কাজেই কেউ আমার এ লেখনী দ্বারা দুঃখিত কিংবা রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

কবির ভাষায়–

اپنوں بھی ناراض بیگانے بھی بیزار

میں کبھی زھر ھلاھل کو نہ کہ سکاقند.

আপন লোক ও আমার প্রতি ভীতশ্রদ্ধ, অপরাপর লোক ও অসন্তুষ্ট কেননা আমি কোন সময় হলাহল বিষকে গুড় বা মিষ্টি বলতে পারি নাই।

আল্লাহ আমাদেরকে সোজা পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِحَقِيْقَةِ الْحَالِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

॥ সমাপ্ত ॥

PDF

BY

MOHAMMAD ABU RASHED

ASSIATANT ENGLISH TEACHER

CHIPATALI ARABIC UNIVERSITY